ইসলাম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

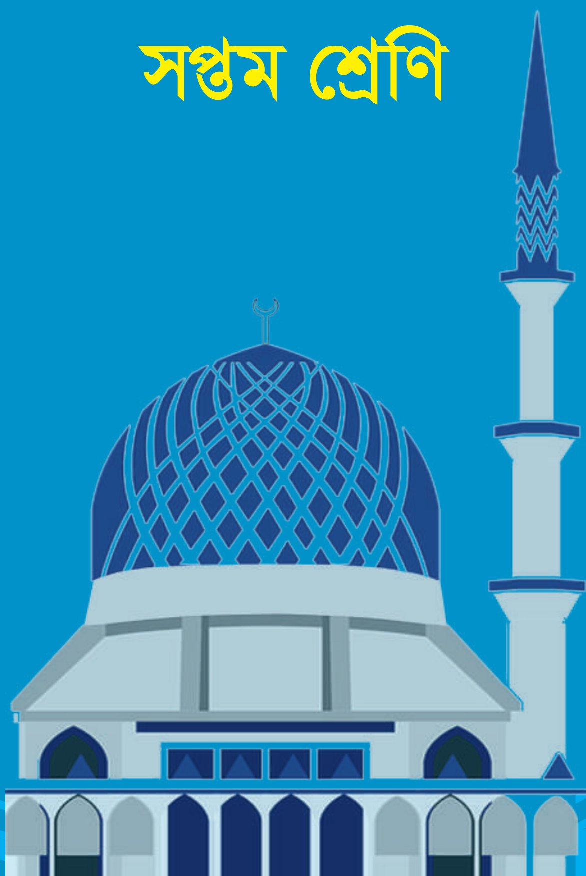

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

হাত ধোয়ার সঠিক নিয়ম

১

পানি ব্যবহার করে সাবান দিয়ে ফেনা তৈরি করতে হবে

২

দুই হাতের পেছন থেকে আঙুলের ফাঁক পরিষ্কার করতে হবে

৩

দুই হাতের তালু এবং আঙুলের ফাঁক পরিষ্কার করতে হবে

৪

দুই হাতের আঙুল আলতোভাবে মুঠো করে ভালোভাবে ঘষতে হবে

৫

দুই হাতের বুড়ো আঙুল হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে পরিষ্কার করতে হবে

৬

এক হাতের পাঁচ আঙুলের নখ দিয়ে অন্য হাতের তালু ভালোভাবে ঘষতে হবে

৭

দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে

৮

হাত ভালোভাবে ধুয়ে শুকনো পরিষ্কার কাপড় বা টিস্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইসলাম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

অধ্যাপক ড. মোঃ নজরুল ইসলাম
ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
ড. আমীর হোসেন
মোঃ আবু হানিফ
ড. মোহাম্মাদ মাসুম বিল্লাহ
ইফফাত নাওমী
মুহাম্মদ আবুল মনসুর
ড. মোঃ ইকবাল হায়দার
উম্মে কুলসুম

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২২
পুনর্মুদ্রণ : ...., ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ
মঞ্জুর আহমদ

গ্রাফিক্স
সিরাজুম মুনির মিজান
মো. সাদ্দাম হোসাইন
মো: আ: হান্নান বিশ্বাস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন ট্রাই-আউটের মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহ করে লেখক এবং বিষয় বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে যৌক্তিক মূল্যায়ন করে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করা যায় পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকটির মাধ্যমে শিখন হবে গভীর এবং জীবনব্যাপী।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

বিষয় পরিচিত

প্রিয় শিক্ষার্থী,
সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকটি এখন তোমার হাতে। আশা করি তুমি জানো, ইসলাম শিক্ষা তোমার জন্য কেবল একটি পাঠ্যবিষয় নয় বরং একটি জীবন বিধান। তাই এবারের নতুন পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে তোমাকে কেবল ইসলামের জ্ঞানদান করা হবে না। সেই সাথে ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধের আলোকে কীভাবে তুমি তোমার জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিতে পারো সে বিষয়েও তোমাকে যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে। ইসলামি আদর্শে জীবন গঠনে তোমার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ইসলাম শিক্ষার এই পাঠ্যপুস্তকটি।

মনে রাখবে, এবারের ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি তুমি কেবল পড়বে না, সেই সাথে শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে বেশ কিছু কাজও করবে। তবে কাজগুলো হবে আনন্দদায়ক এবং জীবনসম্পৃক্ত। এবারে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে তোমাকে মূল্যায়নও করা হবে তোমার কাজের ওপর ভিত্তি করে। তুমি তোমার কাজে এবং আচরণে যত বেশি ইসলামের মূল শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারবে, ততই তোমার ফলাফল ভালো করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। আর তুমি তো জানোই, ইসলামি শিক্ষা মেনে চললে তোমার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন হবে সুন্দর ও সমৃদ্ধ।

আগেই জেনেছ যে, ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে পাঠের পাশাপাশি তোমাকে বেশ কিছু কাজ করতে হবে। তোমার শ্রেণিতে যদি এমন কোনো বন্ধু থাকে যার বিশেষ ধরনের কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন তাহলে তুমি তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার এই পাঠগুলো সম্পন্ন করতে তোমাকে যে কাজ করতে হবে সেগুলো করতে হয়ত তোমার অনেক বন্ধুরই সহায়তা প্রয়োজন হবে। তোমার দায়িত্ব হলো তাদেরকে তোমার সাধ্যমতো সহযোগিতা করা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নাম্বার
প্রথম অধ্যায়	**আকাইদ**	১
	আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইমানের মর্মার্থ	৩
	মালাইকা বা ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান	৯
	আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ইমান	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়	**ইবাদাত**	১৪
	সালাত	১৫
	আযান	২২
	বিভিন্ন প্রকার সালাত	২৪
	সাওম	৪০
	যাকাত	৪৮
তৃতীয় অধ্যায়	**কুরআন ও হাদিস শিক্ষা**	৫৪
	আল কুরআনের পরিচয়	৫৫
	তাজবিদ	৫৮
	ওয়াকফ	৬১
	নাযিরা তিলাওয়াত	৬৩
	সূরা আল-লাহাব	৬৪
	সূরা আন-নাসর	৬৬
	সূরা আল-কাফিরুন	৬৯
	সূরা আল-আসর	৭১
	সূরা আত-তাকাসুর	৭৫
	মুনাজাতমূলক আয়াত	৭৭
	আল হাদিস	৮০
	মুনাজাতমূলক ৩টি হাদিস	৮৩
চতুর্থ অধ্যায়	**আখলাক**	৮৪
	আখলাকে হামিদাহ	৮৫
	আখলাকে যামিমাহ	১০৪
পঞ্চম অধ্যায়	**জীবনাদর্শ**	১১৩
	মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)	১১৩
	হযরত ইসমাঈল (আ.)	১১৭
	হযরত উমর (রা.)	১২০
	উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)	১২২
	খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.)	১২৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	**সম্প্রীতি**	১২৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন শ্রেণির নতুন পাঠে স্বাগত! পাঠে প্রবেশের আগে একটু পাঠাগার ঘুরে আসলে কেমন হয়? দারুণ না! সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু করার আগেই তাহলে চলো শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে কোনো একটি পাঠাগার থেকে ঘুরে আসা যাক। ঘুরে দেখা হয়ে গেলে শিক্ষক তোমাকে এবং তোমার বন্ধুদেরকে কিছু কাজ করতে দিবেন। কাজগুলো সঠিকভাবে পালন করতে করতেই তুমি এই পাঠ্যপুস্তক অনুসারে ইসলামের জ্ঞানার্জন করতে থাকবে।

আকাইদের পরিচয়

আগের শ্রেণিতে তুমি সংক্ষিপ্ত পরিসরে আকাইদের ধারণা পেয়েছ। এ শ্রেণিতে আমরা এ বিষয়ে আরও একটু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। আকাইদ (عَقَائِدٌ) শব্দটি আরবি। এটি বহুবচন, এর একবচন হলো আকিদা (عَقِيْدَةٌ) –যার অর্থ বিশ্বাস। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে আকাইদ বলতে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনকে বোঝায়। ইসলামি আকিদার মূলকথা হলো বিশ্বাস, কর্ম, চিন্তা ও চেতনায় মহান আল্লাহকে সর্বশক্তিমান মেনে নেওয়া এবং শিরক থেকে মুক্ত থাকা।

ইসলামি আকিদাহ-এর মৌলিক বিষয়সমূহ

একজন মুসলিমকে মৌলিক সাতটি বিষয়ে ইমান আনতে হয়-যা আমরা 'ইমান মুফাসসাল' নামক কালেমার মাধ্যমে স্বীকৃতি দেই। এগুলো হলো :

এক – আল্লাহর প্রতি ইমান

দুই – মালাইকা বা ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান

তিন – আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান

চার – নবি-রাসুলগণের প্রতি ইমান

পাঁচ – আখিরাতের প্রতি ইমান

ছয় – তাকদির (ভাগ্য বা নিয়তি) এর ভালো-মন্দের প্রতি ইমান

সাত – মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রতি ইমান

এ ছাড়াও ইসলামি আকিদাহ-এর আরও অনেক ক্ষেত্র বা বিষয় আছে যা তোমরা বড় হয়ে জানতে পারবে।

প্রিয় শিক্ষার্থী, ইসলামি আকিদাহ-এর এ মৌলিক সাতটি বিষয়ের মধ্যে এ শ্রেণিতে আমরা আল্লাহর প্রতি ইমান, মালাইকা বা ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান এবং আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান– এই তিনটি বিষয় নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা করব। তাহলে শুরু করা যাক।

প্রিয় শিক্ষার্থী, পূর্বের শ্রেণিতে তুমি আল্লাহ তা'আলার পরিচয় ও তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে সামান্য ধারণা লাভ করেছ। এ শ্রেণিতে আমরা এ সম্পর্কে আরও কিছু জানব। মূলত আল্লাহ তা'আলার পরিচয়, তাঁর গুণাবলি এত ব্যাপক যে, তার যথার্থ বর্ণনা তুলে ধরার ভাষা ও সামর্থ্য মানুষের নেই। মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ
قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ○

অর্থ: 'বলুন, আমার পালনকর্তার কথা লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমি এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও।' (সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১০৯)

আল্লাহর পরিচয় তাঁর অসংখ্য সৃষ্টি এবং তাঁর দেওয়া অগণিত নিয়ামতের মাঝেই নিহিত। তাই আমরা তাঁর সৃষ্টিরাজি ও নিয়ামত নিয়ে যত বেশি গভীর চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান অর্জন করব তত বেশি তাঁর পরিচয় ও গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পারব।

আল্লাহ তা'আলার পরিচয়

আল্লাহ জগতসমূহের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকের সত্তাবাচক নাম। সর্বোচ্চ সম্মান, প্রশংসা ও ইবাদাত পাওয়ার যিনি একমাত্র অধিকারী, তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ। আল্লাহ নামের কোনো প্রতিশব্দ, অনুবাদ, সমার্থক শব্দ কিংবা প্রতিনিধিত্বমূলক কোনো শব্দ বা নাম নেই। ব্যাকরণে আল্লাহ শব্দটি বিশেষ্যপদ। এর কোনো বচন পরিবর্তন নেই, লিঙ্গান্তর নেই। কোনো ভাষায় এর অনুবাদ করাও সম্ভব নয়। পৃথিবীর সকল ভাষাতে এ শব্দটি অভিন্নরূপে ব্যবহৃত। আল্লাহ শব্দটি কোনো ধাতু থেকে উদ্ভূত নয়। আল্লাহ সর্বদা একবচন, একক, অবিভাজ্য, অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। আল্লাহ শব্দ দ্বারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে বোঝায়। আরবি ভাষায় আল্লাহ নামকে 'ইসমে জাত' বলা হয়। তবে তাঁর অনেক সুন্দর সুন্দর গুণবাচক নাম আছে। আমরা সে সকল নাম ধরেও তাঁকে ডাকতে পারি।

মহান আল্লাহ একক সত্তা। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তিনি অসীম জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অধিকারী। তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। তাঁর তুলনা স্বয়ং তিনি নিজেই। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহর পরিচয়, গুণাবলি ও তাঁর ক্ষমতার বিবরণ বিদ্যমান। সূরা আল-ইখলাসে অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর পরিচয় এসেছে এভাবে —

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

অর্থ: 'বলুন, তিনিই আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।' (সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১-৪)

আল্লাহ ঐ মহান সত্তার নাম, যিনি এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যা কিছু আছে, তিনিই তার মালিক। তিনি সকল জীবের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তিনিই একমাত্র ইলাহ বা উপাস্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমিই আল্লাহ। আমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। অতএব, তুমি আমার ইবাদাত করো এবং আমার স্মরণে সালাত কায়েম করো।' (সূরা ত্বা হা, আয়াত: ১৪)

আল্লাহ এমন এক সত্তা, যিনি সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত এবং সকল সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতার আধার। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী। তিনিই রিযিকদাতা। তিনিই হেদায়াতকারী, বিধানদাতা ও নির্দেশদাতা। সব শক্তি, মাহাত্ম্য ও সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি সকল শক্তির উৎস ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি অপরিসীম রহমতের অধিকারী। তিনিই হাকিম বা মহাবিজ্ঞানী। তিনি পরাক্রমশালী, নিরাপত্তা ও শান্তিদাতা। তিনিই অতীব সূক্ষ্মদর্শী, পরম ধৈর্যশীল ও মহান। এ বিশ্বে যা কিছু আছে সবই একদিন বিলীন হয়ে যাবে কিন্তু তাঁর সত্তা অক্ষয় ও অবিনশ্বর। তিনি অনন্ত ও অসীম। তিনিই ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ইমানের মর্মার্থ

ইমানের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো, আল্লাহর ওপর ইমান বা বিশ্বাস। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন ও তিনি থাকবেন। তিনি আমাদের রব, মালিক ও সৃষ্টিকর্তা। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই ঘটে না। তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি অনন্ত। তিনি পরম সুন্দর ও পরম পবিত্র। তাঁকে ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। তিনি কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল নন। সবকিছুই তাঁর ওপর নির্ভরশীল। কোনো কিছুই তাঁর মতো নয়। এ পৃথিবীতে চর্ম চোখে তাঁকে দেখা সম্ভব নয়। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে, সবকিছুই তাঁর। প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই নেই। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছে জ্ঞান দান করেন। তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন। তাঁর কুরসি আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। সকল কিছুই তাঁর

নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই জীবন দেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। আর তাঁরই কাছে সকলকে ফিরে যেতে হবে। তিনি সর্বশক্তিমান। যখন তিনি কোনো কিছু করার ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন, 'কুন' (হও) আর অমনি তা হয়ে যায়। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি আকাশমণ্ডলীর রব, পৃথিবীর রব ও সকল সৃষ্টির রব। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব ও মহিমা তাঁরই জন্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, সর্বোচ্চ ও সুমহান।

আল্লাহর ওপর ইমান আনার অর্থ হলো, তাঁর অস্তিত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। কোনো সন্দেহ সংশয় ছাড়া এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, তিনি একমাত্র প্রতিপালক (রব), তিনি একমাত্র ইলাহ। তাঁর অনেক সুন্দর নাম ও সিফাত বা গুণ রয়েছে। আল্লাহর ওপর ইমান আনার গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয় হলো:

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি ইমান আনা

ইসলামি শরিয়তের অসংখ্য দলিল আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। মানুষের বিবেকবুদ্ধিও দ্বিধাহীনভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ সাব্যস্ত করে। প্রতিটি সৃষ্টিই স্বপ্রণোদিতভাবে তার স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসী।

কোনো সৃষ্টিই নিজে নিজেকে অস্তিত্ব দান করতে পারে না। আপনাআপনি কোনো কিছু হয়ে যাওয়া অবাস্তব। অবশ্যই একজন অস্তিত্বদানকারী আছেন। আর তিনি হলেন আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۟

অর্থ: 'তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?' (সূরা আত-তূর, আয়াত: ৩৫)

আল্লাহর কর্তৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন

এ বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র রব, একমাত্র প্রতিপালক। এ মহাবিশ্ব পরিচালনায় তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রব বলা হয় তাঁকেই যিনি সৃষ্টি করেন, পরিচালনা করেন এবং মালিকানা যাঁর জন্য। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মালিক নেই। তিনি ছাড়া আর কোনো বিশ্ব পরিচালকও নেই। তিনিই আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিন হতে বান্দার জন্য রিজিক প্রদান করেন। অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই। আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না; কেবল যাকে যতটুকু জ্ঞান দেওয়া হয়, সে ততটুকুই জানে।

আল্লাহই একমাত্র উপাস্য– এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন

মনে-প্রাণে এ কথা বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহই একমাত্র সত্য উপাস্য। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত নয়। উপাসনা প্রাপ্তিতে কেউ তাঁর অংশীদার নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও; (একই সাক্ষ্য দেন)

তিনি ন্যায় ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮) সকল নবি-রাসুলের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল একটিই : 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই, তিনি ব্যতীত কেউ উপাসনার যোগ্য নয়।'

আল্লাহর সুন্দর নাম ও সিফাতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন

আল্লাহ তা'আলার ওপর ইমানের আরও দাবি হচ্ছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর নিজের জন্য তাঁর কিতাবে বা তাঁর রাসুলের সুন্নাহ্'য় যে সমস্ত উপযুক্ত সুন্দর নাম ও সিফাত সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে নিঃসংকোচে মেনে নেওয়া। তাই আমরা আল্লাহর জন্য কেবলমাত্র সেই সব নাম ও সিফাত বা গুণ সাব্যস্ত করব, যা তিনি এবং তাঁর রাসুল (সা.) সাব্যস্ত করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর যে সমস্ত সিফাত বা গুণ বর্ণিত হয়েছে, আমরা তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আল-আসমাউল হুসনা

আল্লাহ তা'আলার পরিচয় বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তিনি সকল গুণের আধার। এমন কোনো উত্তম গুণ নেই যা তাঁর মাঝে নেই। তিনি যেমন অসীম তেমনি তাঁর গুণাবলিও অসীম। তাঁর প্রতিটি গুণের মহিমাজ্ঞাপক পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। এগুলো তাঁর গুণবাচক নাম। আল কুরআনে এগুলোকে 'আল-আসমাউল হুসনা' বা সুন্দরতম নামসমূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪

অর্থ: 'আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। কাজেই তোমরা তাঁকে সে নাম ধরেই ডাকো।' (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৮০)

আমরা আল্লাহর নামের মহিমা, পবিত্রতা ও প্রশংসাজ্ঞাপক নিরানব্বইটি আসমাউল হুসনা বা গুণবাচক নামের কথা জানি। আসলে আল্লাহর গুণবাচক নামের কোনো শেষ নেই। তবে তাঁর এ নিরানব্বইটি নাম বেশি প্রসিদ্ধ। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তাঁর এসব পবিত্র নামের উল্লেখ রয়েছে। এসব নাম থেকে আমরা তাঁর পরিচয় ও গুণাবলি সম্পর্কে জানতে পারি।

আগের শ্রেণিতে আমরা আল্লাহর কয়েকটি গুণবাচক নামের পরিচয় জেনেছি। তারই ধারাবাহিকতায় এ শ্রেণিতে আমরা তাঁর আরও কয়েকটি গুণবাচক নাম সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত জানব। তাহলে শুরু করা যাক।

আল্লাহু খালিকুন (اَللّٰهُ خَالِقٌ)

খালিকুন অর্থ সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ সমস্ত মাখলুকের সৃষ্টিকর্তা। এ জন্য তিনি আল খালিক নাম ধারণ করেন। এ নামটি খালকুন (خَلْقٌ) ধাতু হতে উদ্ভূত, যার অর্থ উৎপাদন করা, তৈরি করা, সৃষ্টি করা। খালিক তিনি, যিনি

কোনো পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন। এ অর্থেই আল্লাহ খালিক। আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে সৃষ্টিগুণ থাকা এক বিশেষ রহস্য। তিনিই অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দেন বা সৃষ্টি করেন। এ ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। আমরা আমাদের চারিদিকে তাকালে যেসব সৃষ্টি দেখতে পাই এগুলো তাঁর খালিক নামের মহিমার ফসল। আল্লাহর সকল সৃষ্টি অতিসুন্দর ও সুনিপুণ। তাঁর সৃষ্টিতে কোনো খুঁত বা ত্রুটি নেই। তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষকে তিনি সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন:

اَلَّذِیۡۤ اَحۡسَنَ کُلَّ شَیۡءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلۡقَ الۡاِنۡسَانِ مِنۡ طِیۡنٍ ۚ

অর্থ: 'যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দরভাবে সৃজন করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।' (সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ৭)

জীবের সৃষ্টি উপাদান ও মহান আল্লাহর সৃষ্টির সক্ষমতা প্রসঙ্গে আল-কুরআনে আরও বলা হয়েছে, 'আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে পানি হতে সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।' (সূরা আন-নূর, আয়াত: ৪৫)

আমরা মহান আল্লাহর খালিক নামের এসব তাৎপর্য উপলব্ধি করে তাঁকে এ নামে ডাকব এবং বিশ্বাস রাখব যে, কেবল আল্লাহই খালিক। তিনি যখন যা ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন। জীবনের ন্যায় মৃত্যুরও স্রষ্টা তিনিই।

আল্লাহু মালিকুন (اَللّٰهُ مَالِكٌ)

মহান আল্লাহর আরেকটি সুন্দর নাম আল-মালিক। মালিক অর্থ অধিপতি, স্বত্বাধিকারী, সর্বাধিকারী, রাজাধিরাজ, বাদশাহ ইত্যাদি। এটি আল্লাহর এমন একটি গুণবাচক নাম যার মাঝে আসমাউল হুসনার অন্য অনেক নামের মাহাত্ম্য বিদ্যমান। এই যে বিশাল পৃথিবী, যেখানে আছে নদীনালা, সাগর, মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত। আরও আছে জানা-অজানা ছোট-বড় অসংখ্য জীবজন্তু, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছগাছালি, ফুল, ফল, ফসল এবং আরও কত কী। আমাদের মাথার ওপর অনন্ত আকাশে আছে চন্দ্র, সূর্য, অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্র। আকারে এ নক্ষত্রগুলো আবার পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড়। আরও আছে আমাদের অজানা কত রহস্যময় জগৎ। এ সৃষ্টি জগতসমূহের সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক ও একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ। সব কিছু তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلِلّٰهِ مُلۡكُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَمَا بَیۡنَهُمَا ؕ یَخۡلُقُ مَا یَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ ○

অর্থ: 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতোদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুর ওপর আল্লাহর আধিপত্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।' (সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ১৭)

তিনিই আদেশদাতা ও নিষেধকারী। তিনিই আমাদের এবং সকল জীবের জীবনের মালিক। তিনিই মৃত্যু, কিয়ামত, আখিরাত, বিচার দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামের মালিক। সব কিছু তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করে। এককথায়, তিনিই সব কিছুর মালিক।

আল্লাহু মালিকুন–এ কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করে আমরা আল্লাহকে এ নামে ডাকব। তাহলে আল্লাহর ওপর আমাদের ইমান আরও দৃঢ় হবে। সকল সম্পদ ও ক্ষমতার মালিক যেহেতু মহান আল্লাহ, তাই দুনিয়াতে আমরা এসব নিয়ে কখনই গর্ব করব না বরং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।

আল্লাহু গাফুরুন (اَللّٰهُ غَفُوْرٌ)

গাফুরুন শব্দের অর্থ হলো ক্ষমাশীল, অত্যন্ত ক্ষমাকারী, পরম ক্ষমাশীল ইত্যাদি। তাই 'আল্লাহু গাফুরুন' কথাটির অর্থ হলো, আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল। আল-গাফুর আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম। এ নামের বরকতে তিনি পাপীর পাপ মোচন করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ؕ

অর্থ: 'যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী এবং কঠোর শাস্তিদাতা ও শক্তিশালী।' (সূরা মু'মিন, আয়াত: ৩)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল। সব কিছুর মালিক হিসেবে তিনি আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করারও মালিক। তিনি ছাড়া আমাদের গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই। পাপীর ক্ষমা চাওয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপসমূহ এমনভাবে ক্ষমা করে দেন যে, তা আমলনামা থেকে মুছে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।' (সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৩)

মহান আল্লাহ এমন মহাক্ষমাশীল যে, বান্দার পাপরাশি যত বেশিই হোক না কেন বা তা যত বড়ই হোক না কেন, তাঁর ক্ষমার সামনে তা অতি সামান্যই।

মানুষ যদি ভুলবশত কোনো অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা পাপ করে নিজেদের প্রতি যুলুম করে বসে, তবে যদি সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে তার নিজের কর্তব্য বলে লিখে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত যদি কোনো মন্দ কাজ

করে, অতঃপর তওবা করে এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৫৪)

আমরা আল্লাহর আল-গাফুর নামের ওয়াছিলা দিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইব। ক্ষমা প্রার্থনাকারী ও তাওবাকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন। আমাদের প্রিয়নবি (সা.)– যাঁর কোনো গুনাহ ছিল না, তদুপরি তিনি আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা চাইতেন।

আল্লাহু খাবিরুন (اَللّٰهُ خَبِيْرٌ)

খাবিরুন অর্থ সর্বজ্ঞাত, সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত ইত্যাদি। আল্লাহু খাবিরুন অর্থ আল্লাহ সম্যক অবহিত বা সর্বজ্ঞাত। আল-খাবির মহান আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম। এ নামটি আল-আলীম, আস-সামী'উ, আল-বাসীর, আল-কাদীর ইত্যাদি নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন:

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩)

মহান আল্লাহ সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছু জানেন। তাঁর জ্ঞানে সব কিছু বেষ্টন করে রাখা। তাঁর জ্ঞান থেকে কোনো স্থান, কাল–কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। আসমান জমিন এবং এতোদুভয়ের মাঝে যেখানে যা কিছুই ঘটে না কেন, কিছুই তাঁর অজ্ঞাতে ঘটে না। তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী। এমনকি সরিষার কণা পরিমাণও যদি কোনো বস্তু পাথরের ভেতর বা আকাশে কিংবা ভূগর্ভে থাকে, তবে তিনি তারও খবর রাখেন। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। দৃশ্য ও অদৃশ্য, প্রকাশ্য ও গোপনীয়, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সব কিছুই জানেন। ছোট-বড় কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে থাকে না এবং তিনি কোনো কিছুই ভুলে যান না। সব কিছু সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন।

আমরা সব সময় মনে রাখব যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভালো-মন্দ সকল কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাই আল্লাহকে ভয় করে আমরা সকল প্রকার অন্যায় ও পাপকাজ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখব এবং ভালো কাজসমূহ করব।

সর্বোপরি, আল্লাহ তা'আলা যেমন মহান, তাঁর নামগুলোও তেমনি মহান, অতি পবিত্র ও গৌরবান্বিত। আমরা তাঁকে আল্লাহ, রহমান কিংবা তাঁর অন্যান্য গুণবাচক নামেও ডাকব।

আল্লাহু মুহাইমিনুন (اَللّٰهُ مُهَيْمِنٌ)

মুহাইমিনুন অর্থ রক্ষক, রক্ষণাবেক্ষণকারী, হেফাজতকারী। এ সৃষ্টিকুলের একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা এবং

তিনিই আমাদের রক্ষক। তিনি আমাদের জাগতিক বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। তাঁরই দেওয়া নিয়ামতের ফলে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে পারি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

অর্থ: 'তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি ও নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যাকে শরিক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র।' (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩)

বাড়ির কাজ: আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নামের একটি সুন্দর চার্ট প্রণয়ন করবে।

মালাইকা বা ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান

মালাইকা বা ফেরেশতাগণের পরিচয়

'মালাইকা' (اَلْمَلَائِكَةُ) শব্দটি আরবি। এটি বহুবচন। এর একবচন মালাক (مَلَكٌ)। বাংলা ভাষায় এর অর্থ হিসেবে ফেরেশতা কথাটি ব্যবহৃত হয়; এটি মূলত ফারসি ভাষার শব্দ। ফেরেশতাগণ আল্লাহর আজ্ঞাবহ জ্যোতির্ময় সত্তা। তাঁরা আল্লাহর বার্তাবাহক। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তাঁরা নিষ্পাপ ও পূত-পবিত্র। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর তাসবিহ ও ইবাদাতে মগ্ন থাকেন। তাঁরা আমাদের প্রিয়নবি (সা.)-এর প্রতিও দরুদ ও সালাম পাঠ করতে থাকেন। তাঁরা মহান আল্লাহর মহাসাম্রাজ্যের কর্মীবাহিনী। তাঁরা নূরের তৈরি। তাঁদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই। তাঁদের পানাহার, নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। তাঁদের সংখ্যা অগণিত। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা জানেন না। তাঁদের কোনো নিজস্ব মত ও কর্মসূচি নেই। মানব চোখের অন্তরালে তাঁরা অবস্থান করেন। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর আদেশ পালনে নিয়োজিত আছেন। আল্লাহর আদেশের বাইরে তাঁরা কিছুই করতে পারেন না। মহান আল্লাহ যাকে যে কাজে নিয়োজিত করেন, তিনি সে কাজেই নিয়োজিত থাকেন। কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ যা আদেশ করেন তারা তা অমান্য করে না এবং তাদের যা করতে আদেশ করা হয় তাই করে।' (সূরা আত-তাহরিম, আয়াত: ৬)

ফেরেশতাগণের গঠন ও আকৃতি

আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বিশেষ আকৃতিতে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা যখন যে রূপ ধারণ করতে বলেন তাঁরা তখন সেই রূপই ধারণ করেন। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমিনের স্রষ্টা এবং ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক। তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট।' (সূরা আল-ফাতির, আয়াত: ১)

প্রধান চার ফেরেশতা

ফেরেশতাগণের মধ্যে চারজন প্রধান ফেরেশতা আছেন। তাঁরা মহান আল্লাহর আদেশে বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত আছেন। ফেরেশতা চারজন হলেন:

১. **জিবরাইল (আ.):** তাঁকে ফেরেশতাগণের সরদার বলা হয়। তাঁর প্রধান দায়িত্ব হলো আল্লাহ তা'আলার বাণীসমূহ নবি-রাসুলগণের নিকট পৌঁছে দেওয়া। তিনিই পবিত্র বাণী নিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে মহানবি (সা.)-এর কাছে আসতেন। এ ছাড়া তিনি অন্যান্য কর্তব্যরত ফেরেশতার নিকট বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর দেওয়া নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেন।

২. **মিকাইল (আ.):** তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে বৃষ্টি বর্ষণ, উদ্ভিদ উৎপাদন ও সকল জীবের জীবিকা বণ্টন।

৩. **ইসরাফিল (আ.):** তাঁর দায়িত্ব মহান আল্লাহর নির্দেশক্রমে কিয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া। ইসরাফিল (আ.)-এর শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৪. **আজরাইল (আ.):** যিনি মালাকুল মওত নামেও পরিচিত। মহান আল্লাহর আদেশে প্রাণিকুলের জান কবজের কাজে তিনি নিয়োজিত।

এ ছাড়াও কিছু ফেরেশতা মানুষের আমলনামা সংরক্ষণ করেন। তাঁদের বলা হয় কিরামুন কাতিবিন। কিছু ফেরেশতা মানুষকে জাগ্রত অবস্থায়, নিদ্রায়, সফরে, বাড়িতে সর্বত্র সব সময় হেফাজত করেন। তাঁদের বলা হয় 'মুয়াক্কিবাত'। কিছু আছেন জান্নাত-জাহান্নামের পাহারায়। উল্লেখ্য যে, জান্নাতের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতার নাম 'রেদওয়ান' এবং জাহান্নামের রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতার নাম 'মালেক'। কতিপয় ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন আল্লাহর আরশ বহনের দায়িত্বে। একদল ফেরেশতা আছেন যাঁরা আল্লাহর জিকিরের মজলিসে মজলিসে ঘুরে বেড়ান। কিছু ফেরেশতা পাহাড়ের হেফাজতে আছেন। কিছু ফেরেশতা আল্লাহর সম্মানে সারাক্ষণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। এভাবে আরও অসংখ্য অগণিত ফেরেশতা আল্লাহর হুকুমে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত আছেন।

ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান

মহান আল্লাহ ফেরেশতাগণের মাধ্যমে তাঁর জগতসমূহ পরিচালনা করেন। তাদেরকে যা আদেশ করেন তারা তা-ই পালন করেন। মানুষের মধ্যে বাধ্যতা ও অবাধ্যতা দুটি প্রবৃত্তিই রয়েছে। কিন্তু ফেরেশতাগণের মধ্যে অবাধ্যতার প্রবৃত্তি নেই। তাঁদেরকে সৃষ্টিগতভাবেই আল্লাহর অনুগত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস রাখা ইমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেউ যদি ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান না রাখে তাহলে সে ইমানদার থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝

অর্থ: 'যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসুলগণের ওপর বিশ্বাস রাখবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে গিয়ে পড়বে।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৬)

ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান আনা ফরয বা অত্যাবশ্যক। তাই আমরা মহান আল্লাহর ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান আনব এবং তাঁদের প্রতি যথাযথ ভালোবাসা পোষণ করব।

আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ইমান

আল্লাহর কিতাব

যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নবি-রাসুলগণের ওপর অনেক কিতাব নাযিল করেছেন। নবি-রাসুলগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে যেসব কিতাব বা গ্রন্থ লাভ করেছেন সেসব ধর্মগ্রন্থই আল্লাহর কিতাব। এগুলোকে আসমানি কিতাবও বলা হয়। মহান আল্লাহ হযরত জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে তাঁর বাণীসমূহ নবি-রাসুলগণের নিকট প্রেরণ করেছেন। অতঃপর নবি-রাসুলগণ তা সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত নাজিলকৃত সব আসমানি কিতাবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ইমানের অঙ্গ।

কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনার অর্থ ও তাৎপর্য

মানব জাতির জন্য হেদায়াত ও আলোকবর্তিকা হিসেবে সত্য ধর্ম নিয়ে সকল আসমানি কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এগুলো আল্লাহর কালাম বা বাণী। এ বাণীসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জিবরাইল (আ.)- এর মাধ্যমে রাসুলগণের নিকট নাযিল হয়েছে। কিতাবসমূহের প্রতি ইমান আনার অর্থ হলো– যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির হেদায়াতের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাবসমূহ নাযিল হয়েছে সেগুলোকে সত্য বলে মুখে স্বীকার ও অন্তরে বিশ্বাস করা।

আমরা জেনেছি, নবি ও রাসুলগণের মধ্য থেকে রাসুলগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কিতাব পেয়েছেন। কিন্তু কিতাবপ্রাপ্ত সকল রাসুলের নাম এবং তাঁদের কিতাব সম্পর্কে বর্ণনা কুরআন-হাদিসে উল্লেখ নেই। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ আমাদের প্রিয় রাসুল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন–'আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি।' (সূরা গাফির, আয়াত: ৭৮)

তাই আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে যেগুলোর নাম আমরা জানি, সেগুলোর প্রতি যেমন ইমান আনতে হবে তেমনি নাম না জানা আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতিও ইমান আনতে হবে। এক কথায়, সকল আসমানি কিতাবের ওপর ইমান আনা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মু'মিনগণ! তোমরা ইমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসুলের প্রতি আর সেই কিতাবের প্রতি যা তিনি নাযিল করেছেন তাঁর রাসুলের ওপর এবং ঐ সকল কিতাবের প্রতিও যা তিনি নাযিল করেছেন তার পূর্বে। আর যে কুফরি করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি এবং পরকালের প্রতি, সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।' (সূরা আন নিসা, আয়াত: ১৩৬)

আমরা শেষ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উম্মাত। তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের নাম আল-কুরআন। আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি আমাদের ইমান যথার্থ হওয়ার জন্য আমাদেরকে পূর্বের সকল নবি-রাসুলের ওপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহকে সত্য বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করতে হবে; আর আল কুরআনকে সত্য বলে মুখে স্বীকার ও অন্তরে বিশ্বাস করে এ কুরআনে বর্ণিত সকল বিধি-বিধান মেনে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে পূর্বের সকল আসমানি কিতাব এবং তার বিধান রহিত হয়েছে। তাই পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে কেবল বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে কিন্তু সেসব কিতাবের বিধি-বিধানসমূহ আমাদের পালন বা বাস্তবায়ন করতে হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য কেবল আল-কুরআন অনুসরণ ফরয।

আরও উল্লেখ্য যে, পূর্বের সকল কিতাব সত্য কিন্তু যুগে যুগে এগুলোতে মারাত্মক বিকৃতি ঘটেছে। আল কুরআন যাবতীয় বিকৃতি থেকে মুক্ত ও সুরক্ষিত। কারণ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ○

অর্থ: 'আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।' (সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯)

কিতাবসমূহের পরিচিতি

আল-কুরআনে কেবল ৪ খানা প্রধান কিতাব এবং ২৫ জন নবি-রাসুলের নাম ও প্রসঙ্গ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এ ছাড়া আল-কুরআনে হযরত ইবরাহীম ও হযরত মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি কতিপয় 'সহিফা' (পুস্তিকা বা ছোট কিতাব) নাযিলের এবং যুগে যুগে অন্য রাসুলগণের (আ.) ওপর আরও অনেক সহিফা নাযিলের কথা উল্লেখ আছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই এটি রয়েছে পূর্ববর্তী সহিফাসমূহে; ইবরাহিম ও মুসার সহিফাসমূহে।' (সূরা আল-আ'লা, আয়াত: ১৮-১৯) কিন্তু এগুলোর নাম ও সংখ্যা আল কুরআনে বর্ণিত হয়নি। একমতে, এ সহিফাসমূহের সংখ্যা মোট ১০০ খানা। সে অনুসারে প্রধান চার কিতাব ও সহিফাসমূহ মিলিয়ে মোট আসমানি কিতাবের সংখ্যা ১০৪ খানা। প্রধান চারখানা কিতাব হলো—

১. তাওরাত

তাওরাত হযরত মূসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমি মুসাকে কিতাব (তাওরাত) দিয়েছিলাম যাতে তারা সৎপথ পায়।’ (সূরা আল মু’মিনূন, আয়াত: ৪৯)

২. যাবুর

যাবুর হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আর আমি দাউদকে দিয়েছি যাবুর।’ (সূরা আল ইসরা, আয়াত: ৫৫)

৩. ইঞ্জিল

ইঞ্জিল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আমি তাদের পশ্চাতে ইসা ইবনে মরিয়মকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি। এতে হেদায়েত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়ন করে পথ প্রদর্শন করে এবং এটি আল্লাহভীরুদের জন্যে হেদায়েত ও উপদেশ বাণী।’ (সূরা আল মায়িদা, আয়াত: ৪৬)

৪. আল-কুরআন

আল-কুরআন শেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে। আল-কুরআনের আরেক নাম ফুরকান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জিল- ইতোপূর্বে মানবজাতির সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য; আর তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন।’ (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩-৪)

আসমানি কিতাবসমূহে বিশ্বাস করা ইমানের মৌলিক সাতটি বিষয়ের মধ্যে একটি। আমরা জানা-অজানা সকল আসমানি কিতাবে বিশ্বাস রাখব এবং আল-কুরআনের বিধি-বিধান মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করব।

এতক্ষণ যা কিছু জানলে তা যে কুরআন এবং হাদিসের শিক্ষা তা তুমি কীভাবে বুঝবে? কুরআন এবং হাদিস পাঠ করে, তাই না? তাহলে এখন কুরআন এবং হাদিসের কোথায় কোথায় আকাইদের এই বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে তা খুঁজে বের করো। এই কাজে শিক্ষক ও অন্য বন্ধুদের সহায়তা নাও। প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য এবং গুরুজনদেরকে জিজ্ঞেস করো। অর্থসহ কুরআন এবং হাদিস পাঠ করেন বা কুরআন-হাদিস এর ব্যাখ্যা খুব ভালোভাবে জানেন এমন কাউকে জিজ্ঞেস করেও তুমি এই কাজটি করতে পারো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইবাদাত

প্রিয় শিক্ষার্থী, এই অধ্যায় থেকে তুমি দুটি অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। বেশ কিছু কাজ করার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে তুমি এই অধ্যায়ের মূল শিক্ষা আত্মস্থ করতে পারবে। তবে অধ্যায়ের পাঠে প্রবেশের পূর্বেই একটু মাথা খাটিয়ে চিন্তা করে দেখো তো ইবাদাত সম্পর্কে তুমি কি কি জানো? ষষ্ঠ শ্রেণিতে কি তুমি ইবাদাত সম্পর্কে কোনো কিছু পড়েছিলে বা শিখেছিলে? মনে করার চেষ্টা করে দেখো তো। এব্যাপারে তোমার সহপাঠী বন্ধুদের সহায়তা নাও, প্রয়োজনে শিক্ষকও তোমাদের সহায়তা করবেন। শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে কাজ করতে থাকো, তাহলেই এই অধ্যায় থেকে অনেক নতুন বিষয় জানতে পারবে, শিখতে পারবে আর কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

ইবাদাতের পরিচয়

ইবাদাত আরবি শব্দ। এর অর্থ আনুগত্য করা, দাসত্ব করা। ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তাঁর প্রেরিত রাসুলের দেখানো পথে জীবন পরিচালিত করাকে ইবাদাত বলে। আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতিকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শরীয়ত সমর্থিত যেকোনো কাজই ইবাদাত। আগের শ্রেণিতে তোমরা ইবাদাতের পরিচয়, তাৎপর্য ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জেনেছ। ইসলামের প্রধান কয়েকটি ইবাদাত সম্পর্কে তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে জানতে পেরেছ। এখানে আমরা ইসলামের মৌলিক ইবাদাতসমূহের মধ্যে সালাত (নামাজ), সাওম (রোযা) ও যাকাত সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানব।

সালাত

প্রিয় শিক্ষার্থী! পূর্বের শ্রেণিতে তুমি সালাত সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় শিখেছ। আগের শ্রেণির আলোচনার ধারাবাহিকতায় এ শ্রেণিতে পর্যায়ক্রমে তুমি সালাতের তাৎপর্য, উপকারিতা, ফজিলত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, সালাতের ইমামতি, আযান ও ইকামত সম্পর্কে শিখবে ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করবে। এ ছাড়া তুমি সালাতুল বিতর, সালাতুল জুমু‘আ, সালাতুল জানাযা, সালাতুল ‘ঈদাইন, সালাতুত তারাবিহ, মাসবুক ব্যক্তির সালাত, রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত, মুসাফিরের সালাত, সালাতের নিষিদ্ধ সময়, সাহু সিজদা এবং সালাত সংশ্লিষ্ট তাসবিহ ও দোয়াসমূহের তাৎপর্য ও মর্ম বাণী, আদর্শ জীবন গঠনে সালাতের ভূমিকা, সালাত আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি নির্বাচিত সূরা ইত্যাদি সম্পর্কে শিখবে ও যোগ্যতা অর্জন করবে। তাহলে এবার মূল আলোচনা শুরু করা যাক।

সালাতের তাৎপর্য

ইমানের পর ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি বা রুকন হলো সালাত। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিয়েছেন। মুমিনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বড় ফরয ইবাদাত হলো সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। পবিত্র কুরআন এবং হাদিসে সালাতকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করা মুমিনদের ওপর ফরয।’ (সূরা নিসা, আয়াত: ১০৩) কুরআন মাজিদে প্রায় ৮২ স্থানে আল্লাহ তা‘আলা সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে সালাতের আদেশ দিন এবং এর ওপর অবিচল থাকুন।’ (সূরা: ত্বা-হা, আয়াত: ১৩২)

সালাতের ক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করব। নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ে সচেষ্ট হবো। মহান আল্লাহ সকল মুমিন ও জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, ‘আর যারা নিজেদের সালাতসমূহের ব্যাপারে যত্নবান থাকে।’ (সূরা আল্-মুমিনূন, আয়াত: ৯)

ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত আদায় না করা মহাঅপরাধ ও বড় গুনাহ। আন্তরিক সদিচ্ছা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যাওয়া কিংবা ঘুমিয়ে পড়ার কারণে সালাত ছুটে গেলে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সালাতের কাযা আদায় করতে হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘ঘুমের কারণে যার সালাত ছুটে গেছে সে যেন জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে সালাত আদায় করে নেয়।’ (মুসলিম)

সালাত বা নামাজ শব্দটির একটি অর্থ হলো ‘সংযোগ’। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে আমরা নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করি। নানা কারণে মাঝে মাঝে আমরা নিজেদেরকে অসহায় অনুভব করি। নিজেকে নিরুপায় ও একাকী মনে করার কোনো কারণ নেই। মহান আল্লাহ অবশ্যই আমাদের সাথে আছেন। যে কোনো সময় আমরা সালাতে দাঁড়িয়ে, তাঁর সামনে মাথা নত করে বুকের ভেতর জমে থাকা সব দুঃখ, কষ্ট, অপমান, হতাশা উজাড়

করে দিতে পারি। তিনি অবশ্যই তা শুনবেন। তিনি সব কিছু শোনেন অথচ আমরা তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপন করি না। আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্য ও বিনয় প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে সালাত। সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করে। সালাত হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির অন্তরের প্রশান্তি এবং তার সাহায্যকারী। সালাত বিপদ-আপদে আত্মাকে শক্তিশালী করে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন 'তোমরা ধৈর্য এবং সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।' (সূরা আল্-বাকারা, আয়াত: ১৫৩)

সালাতের উপকারিতা

মানুষের কল্যাণের জন্য ফরয সালাতের বিধান দেওয়া হয়েছে। সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন উপকার পেতে পারে। যেমন,

শারীরিক উপকারিতা: সালাত এমন একটি ইবাদাত যার মাধ্যমে শরয়ী উপকারিতার পাশাপাশি শরীরচর্চার অধিকাংশ উপকারিতাই পাওয়া যায়। যথাযথভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে ফুসফুস, মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, মাংসগ্রন্থি, ঘাড় ইত্যাদি অঙ্গের রোগের উপকার পাওয়া যায়। স্নায়ুবিক দুর্বলতা ও জোড়ায় ব্যথা সারানোর জন্য সালাত অধিক উপকারি বলে চিকিৎসকগণ অভিমত পোষণ করেন। এ কথা সত্য যে, সালাতে সিজদার সময় মস্তিষ্কতন্ত্রী, চোখ ও মাথাসহ অন্যান্য অঙ্গে রক্তপ্রবাহ পরিমিত পর্যায়ে থাকে। ফলে চোখের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও মস্তিষ্ক প্রখর হয়। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আমাদের শরীরকে সচল ও কার্যকর রাখা নিশ্চিত করে। আলস্য বা কর্মবিমুখতা দূর হয়। তবে সালাতের মূল উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর প্রতি আত্মনিবেদন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

মানসিক উপকারিতা: বর্তমানে মানুষের অশান্তির মূল কারণ হলো মানসিক অস্থিরতা। এই অস্থিরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সারা বিশ্বে গবেষণা হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ধ্যান (meditation)-এর প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সালাত হলো এক উন্নতমানের ধ্যান (meditation)। কেউ যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন ও আমার সব অবস্থা জানেন, তাহলে তার কোনো প্রকার হতাশা থাকতে পারে না। এ ছাড়া মহানবি (সা.) যখন কোনো পেরেশানিতে ভুগতেন তখন তিনি হযরত বেলাল (রা.)-কে বলতেন 'হে বেলাল, সালাতের ব্যবস্থা করে আমাদের শান্তি দাও।' (আবু দাউদ) বস্তুত মানুষের শরীর ও মন এক অপরের পরিপূরক। সালাত আদায়ের মাধ্যমে মন উৎফুল্ল থাকে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপকারিতা: মসজিদ হলো মহান আল্লাহ তা'আলার ঘর, যেখানে দৈনিক পাঁচবার সম্মিলিতভাবে সালাত আদায় করা হয়। সেখানে ধনী-গরিব কোনো ভেদাভেদ থাকে না। সকলে স্ব স্ব পদমর্যাদা ভুলে মহান আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়। একে অপরের খোঁজখবর নিয়ে সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ায়। ফলে মুসলিম সমাজের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। সালাত আদায়ের মাধ্যমে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। আর নিয়মিত সালাত আদায় করলে সমাজ হতে অপসংস্কৃতি দূর হয়।

সালাতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

ইসলাম আমাদের দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা। আর এ দ্বীনের ভিত্তি হলো সালাত। সালাত সকল ইবাদাতের প্রধান। মুমিনের জন্য সালাত মিরাজস্বরূপ। বস্তুত সালাতের মাহাত্ম্য ও উপকারিতা অশেষ। সালাত আদায়ের মাধ্যমে অগণিত কল্যাণ লাভ করা যায়।

সালাতে রয়েছে দুনিয়া আখিরাতের মহাসফলতা। আল-কুরআনে বিনয় ও নম্রতার সাথে সালাত আদায়কারী মুমিনদের সফলকাম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে।’ (সূরা আল-আ‘লা, আয়াত: ১৪-১৫)

সালাত অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ। কেননা সালাত কায়েমকারী নিজের মাঝে আল্লাহভীতি অনুভব করে যা তাকে সকল অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

অর্থ: ‘নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।’ (সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৪৫)

সালাত আদায়ের মাধ্যমে বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা লাভ করে। যেমন মহানবি (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়) চলে গেল।’ (মুসলিম)

সালাত মুমিনদের জন্য দুনিয়ার জীবনে দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয় মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। যখন কোনো মন্দ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারীগণ ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।’ (সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩)

সালাতের মধ্যে রিজিকের প্রশস্ততা রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘এবং আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন আর তাতে অবিচল থাকুন, আমি আপনার নিকট কোনো রিযিক চাই না, আমিই আপনাকে রিযিক প্রদান করি এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।’ (সূরা ত্বা হা, আয়াত: ১৩২) ইবনে কাসীর (রহ.) এ আয়াতের তাফসিরে বলেন, যদি সালাত প্রতিষ্ঠা করো তাহলে এমনভাবে তোমার নিকট রিযিক আসবে, যার ধারণাও তুমি করতে পারবে না।

সালাত হলো উত্তম যিকির। কারণ সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণটাই আল্লাহর যিকির। মহান আল্লাহ তাঁর যিকিরের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আমার স্মরণের লক্ষ্যে সালাত কায়েম কর।’ (সূরা ত্বা-হা, আয়াত : ১৪)

যিকিরের মাধ্যমে আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝

অর্থ: 'জেনে রাখো! আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।' (সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ২৮)

সালাত সর্বোত্তম আমল। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) মহানবি (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, 'সময়মতো সালাত আদায় করা।' (বুখারি ও মুসলিম)

সালাত হিফাযত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' (আবু দাউদ) অন্য হাদিসে মহানবি (সা.) বলেন, 'যে সালাতের হিফাযত করল, সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও কিয়ামতের দিন মুক্তির কারণ হবে।' (মুসনাদে আহমদ)

সালাত আদায়ের মধ্যদিয়ে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা যায়। তা বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর সিজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।' (সূরা আল-আলাক্ব, আয়াত: ১৯)

মহানবি (সা.) বলেন, 'বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সিজদাহরত অবস্থায়। অতএব, তোমরা সিজদায় বেশি বেশি দোয়া করো।' (মুসলিম)

সর্বোপরি সালাতের মাহাত্ম্য অপরিসীম। সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভ করা যায়। এর মাধ্যমে সকল প্রকার অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে দূরে থেকে অন্তরের প্রশান্তি লাভ করা যায়। এটি পাপমুক্তির উপায়। এক কথায় সালাত দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও সফলতা লাভের মাধ্যম।

সালাত আদায়ে একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা

আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে একাগ্রতার সাথে সালাত আদায় করা। সালাতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নিকট তার আবেদন নিবেদন পেশ করে তৃপ্তি লাভ করতে পারে। আর আল্লাহ তা'আলাও বান্দার আবেদন কবুল করে থাকেন। তাহলে বান্দাকে অবশ্যই বিনয়ের সাথে সালাতে দাঁড়াতে হবে। যেমন: কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ۝

অর্থ: 'তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ২৩৮)

নামায অবস্থায় বান্দার মন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে অথচ মুসল্লি টেরও পায় না। কারণ, মানব মন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। গভীর মনোযোগের সাথে কোনো কাজে নিয়োজিত না হলে মন স্থির থাকে না। তা ছাড়া শয়তান হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে বান্দার সকল ইবাদাত বিশেষত সালাত নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন বিষয় মনের মধ্যে হাজির করে দেয়। তাই বান্দার মন সালাতে স্থির থাকে না। এজন্যই বান্দাকে খুশু খুযু (বিনয় ও একাগ্রতা) ও মনের স্থিরতার সাথে সালাত আদায় করতে হবে। যেমন: পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ

অর্থ: 'মুমিনগণ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী।' (সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত: ১,২)

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাকাআতসমূহ

ফজর: ফজরের সালাত মোট ৪ রাকাআত। এর মধ্যে ২ রাকাআত সুন্নাত মুয়াক্কাদাহ এবং ২ রাকাআত ফরয। প্রথমে সুন্নাত আদায় করতে হয় এবং তারপরে ফরয আদায় করতে হয়। মনে রাখবে, ফজরের সুন্নাত সালাতের গুরুত্ব অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নাত সালাতের চেয়ে অনেক বেশি।

যোহর: যোহরের সালাত মোট ১০ রাকাআত। তা হলো– ৪ রাকাআত সুন্নাত মুয়াক্কাদাহ– যা সাধারণত এ ওয়াক্তের ফরয সালাতের পূর্বে আদায় করতে হয়, তারপর ৪ রাকাআত ফরয সালাত আদায় করতে হয় এবং ফরযের পরে আরও ২ রাকাআত সুন্নাত সালাত আদায় করতে হয়।

আসর: আসরের সালাত ৪ রাকাআত-যা ফরয। তবে এ ফরযের পূর্বে ৪ রাকাআত সুন্নাত সালাত আদায় করা অনেক সাওয়াবের কাজ। তবে এটি না করলে কোনো গুনাহ নেই।

মাগরিব: মাগরিবের সালাত মোট ৫ রাকাআত। এর মধ্যে ৩ রাকাআত ফরয এবং ফরয শেষে অনতিবিলম্বে ২ রাকাআত সুন্নাত মুয়াক্কাদাহ সালাত আদায় করতে হয়।

এশা: এশার সালাত মোট ৬ রাকাআত। প্রথমে ৪ রাকাআত ফরয সালাত আদায় করতে হয়। তারপর ২ রাকাআত সুন্নাত মুয়াক্কাদাহ সালাত আদায় করতে হয়। এশার ফরযের পূর্বেও ৪ রাকাআত সুন্নাত সালাত আদায় করা হয়, যা না করলে কোনো গুনাহ নেই, করলে সাওয়াব হয়।

এক নজরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাকাআতসমূহ				
ওয়াক্ত	সুন্নাত (মুয়াক্কাদাহ)	ফরয	সুন্নাত (মুয়াক্কাদাহ)	ওয়াজিব
ফজর	২ রাকাআত	২ রাকাআত		
যোহর	৪ রাকাআত	৪ রাকাআত	২ রাকাআত	
আসর		৪ রাকাআত		
মাগরিব		৩ রাকাআত	২ রাকাআত	
এশা		৪ রাকাআত	২ রাকাআত	৩ রাকাআত (বিতর সালাত)
মোট ফরয সালাত		= ১৭ রাকাআত		

জামাআতে সালাত আদায়

জামাআত শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ হলো একত্রিত হওয়া, জনসমাবেশ, সমবেত হওয়া ইত্যাদি। শরিয়তের দৃষ্টিতে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে মুসলিম সম্প্রদায়ের ইমামের পেছনে সমবেত হয়ে সালাত আদায় করাকে জামাআতে সালাত আদায় বলা হয়।

জামাআতে সালাত আদায়ের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব

ইসলামে জামাআত বা সমবেতভাবে সালাত আদায় করার গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বিভিন্নস্থানে জামাআতবদ্ধ হয়ে সালাত আদায়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

অর্থ: ‘তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।’ (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩)

এই আয়াতে মূলত জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি রাসুলে করিম (সা.) এর জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো তিনি কখনও জামাআত ছাড়েননি। জামাআতে সালাত আদায়ের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে মহানবি (সা.) বলেছেন, ‘জামাআতে সালাত আদায়ের মাহাত্ম্য একাকী সালাত আদায়ের চেয়ে ২৭ গুণ বেশি।’ (বুখারি ও মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা সেদিন আরশের নিচে ছায়া প্রদান করবেন, যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হলো ঐ ব্যক্তি যার আত্মা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। অর্থাৎ সালাত ও জামাআতের প্রতি অধীর আগ্রহী ব্যক্তি।’ (বুখারি ও মুসলিম) বিশিষ্ট মুসলিম মনীষী সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রহ.) পঞ্চাশ বছর সময় ধরে ফরয সালাতে কোন মানুষের ঘাড় দেখেননি। অর্থাৎ তিনি প্রথম কাতারে শামিল ছিলেন। আর ইবনে সামাআহ (রহ.) বলেন, চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমার তাকবিরে উলা তথা প্রথম তাকবির ছোটেনি। শুধুমাত্র সে দিন ছাড়া যে দিন আমার মায়ের ইন্তেকাল হয়েছিল। অতএব কখনও কেউ মসজিদে জামাআতে শরিক হতে অপারগ হলে একাকী সালাত আদায় না করে বাসায় পরিবার পরিজনকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করা উত্তম।

জামাআতে সালাত আদায় করার ফলে মুসল্লিদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব, মহব্বত, ঐক্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। তাই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও অধিক সাওয়াব পাওয়ার আশায় প্রত্যেক মুমিন বান্দার জামাআতে সালাত আদায় করা একান্ত প্রয়োজন।

ইমাম

ইমাম শব্দের অর্থ নেতা। ইমাম সালাত পরিচালনা করেন। জামাআতে সালাত আদায়ের সময় মুসল্লিগণ যাকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করে তিনিই ইমাম। ইমামতি করা দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা স্বয়ং নবি করিম (সা.) সারা জীবন করে গেছেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর চার খলিফা তা সম্পাদন করেছেন। মুসলিম সমাজের উত্তম ব্যক্তিরাই সাধারণত এই পবিত্র দায়িত্বটি পালন করে থাকেন। মহান আল্লাহ জামাআতবদ্ধভাবে সালাত আদায় করার আদেশ করেছেন। আর সেই আদেশ ইমাম ব্যতীত বাস্তবায়িত হয় না। মহানবি (সা.)-এর আমলেও প্রত্যেক এলাকায় মসজিদে বা সাময়িক কোনো স্থানে একজন ইমামের নেতৃত্বে সালাত আদায় হতো। উপস্থিত মুসল্লিদের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির ইমামতি করাই নিয়ম। তবে সময় মতো উপযুক্ত ইমাম পাওয়া যায় না বলে এখন মসজিদে সুনির্দিষ্ট ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইমামতি সাধারণ কোনো পেশা নয়। এর রয়েছে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেবার মানসিকতা নিয়েই এ পেশায় আত্মনিয়োগ করা উচিত। একজন ইমাম শুধু মসজিদের ইমাম নন, তিনি সমাজেরও ইমাম। তিনি মানুষ, মনুষ্যত্ব ও সমাজ নিয়ে ভাবেন।

ইমামের মূল দায়িত্ব হলো, সালাতে নেতৃত্ব দেওয়া। নামাজের যাবতীয় দিক খেয়াল রাখা একজন ইমামের জন্য অবশ্য কর্তব্য। সালাতে কাতার ঠিক করা। সালাত যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘তোমাদের কেউ লোকদের ইমামতি করলে সে যেন সালাত সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে ছোট বালক, দুর্বল ও অসুস্থ লোক থাকতে পারে।’ (বুখারি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তিকে তোমাদের ইমাম নিয়োগ করবে। কারণ তিনি হবেন তোমাদের পক্ষে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতিনিধি।' (দারাকুতনি) ইমামকে হতে হবে সকলের আস্থাভাজন। মুসল্লিদের সালাত শুদ্ধ হচ্ছে কিনা তিনি তা খেয়াল রাখবেন। যারা সালাত পালন করে না, তাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে মসজিদে আনার ব্যবস্থা করবেন। ইমামের সংস্রবে থেকে মুসল্লিরা ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য, সহমর্মিতা ও অন্যান্য নৈতিক গুণ অর্জন করবে।

মুক্তাদি

যারা ইমামের পেছনে তাঁকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করে তারাই মুক্তাদি। মুক্তাদি ইমামের পেছনে মনে মনে এই নিয়ত করবে যে, 'আমি এই ইমামের অনুসরণ করে সালাত আদায় করছি।' সালাতের যাবতীয় কাজে মুক্তাদি ইমামের অনুসরণ করবে।

মুক্তাদির কর্তব্য

ইকামত হওয়ার সাথে সাথে সালাতে দাঁড়িয়ে যাবে। ফরয সালাতের ইকামত হলে সুন্নাত পড়বে না। নিজ দায়িত্বে কাতার সোজা করবে। সামনের কাতারগুলো আগে পূরণ করবে। কাতারের মধ্যকার ফাঁকা জায়গা না রেখে একে-অপরের সাথে মিলিয়ে দাঁড়াবে। দুই কাতারের মাঝে ব্যবধান বেশি রাখবে না। সামনের কাতারে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে। পরে এসে মানুষ ডিঙিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। ইমামের পেছনে দাঁড়াবে ও তাঁকে অনুসরণ করবে। রুকু, সিজদা, বসা বা ওঠা কোনোটাই ইমামের আগে আগে করবে না। সব কাজ ইমামের অব্যবহিত পরে করবে। যদি ইমাম ভুল করেন, তবে নিকটবর্তী মুক্তাদি সংশোধন করে দেবেন। এক্ষেত্রে 'আল্লাহু আকবার' বলে ইমামকে সতর্ক করবেন অথবা ভুলে যাওয়া আয়াত শুদ্ধভাবে পড়ে তাকে সাহায্য করবেন।

আযান

আযান আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো ডাকা, আহবান করা, ঘোষণা করা। শরিয়তের পরিভাষায়, নির্ধারিত আরবি বাক্যসমূহের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে উচ্চকণ্ঠে নামাযে আহবান করাকে আযান বলে। আযান ইসলামের প্রতীক। আযানের ধ্বনি শুনে মুসলমানেরা সালাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। মুসলমানদের কাছে আযানের গুরুত্ব অপরিসীম। সালাতে আযান ও ইকামত দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। মুয়াক্কাদা অর্থ যা পালনের ওপর জোর দেওয়া।

সালাত ফরয হওয়ার পর পবিত্র মক্কা নগরীতে আযান ছাড়াই সালাত পড়া হতো। প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে তথায় মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদে মুসলমানদের সালাতে অংশগ্রহণের জন্য একত্রিত করতে আযানের প্রচলন হয়। আযানের শব্দগুলো ওহির মাধ্যমে প্রাপ্ত। ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন ছিলেন হযরত বেলাল (রা.)। আযানের বহু গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। মুয়াযযিনের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন—

اَلْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ: 'কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনের ঘাড় সবার চাইতে উঁচু হবে।' (মুসলিম) অর্থাৎ তাদেরকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হবে।

আযানের শব্দসমূহ

নামাযের সময় হলে পূতপবিত্র হয়ে কোনো উঁচু স্থানে কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে (দুই কানে শাহাদাত আঙুলদ্বয় প্রবেশ করিয়ে) উঁচুস্বরে আযানের নিম্নোক্ত বাক্যগুলো থেমে থেমে উচ্চারণ করতে হয়:

ক্রমিক নং	আযানের বাক্যসমূহ	বাক্যসমূহের অর্থ	উচ্চারণ করতে হবে
১	اَللهُ اَكْبَرُ	আল্লাহ মহান	৪ বার
২	اَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই	২ বার
৩	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসুল	২ বার
৪	حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ	এসো সালাতের দিকে	২ বার
৫	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	এসো সফলতার দিকে	২ বার
৬	اَللهُ اَكْبَرُ	আল্লাহ মহান	২ বার
৭	لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ	আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই	১ বার

ফজরের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর পর اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (ঘুমের চেয়ে নামায উত্তম) বাক্যটি দুইবার বলতে হয়। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ উচ্চারণের সময় ডান দিকে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ উচ্চারণের সময় বাম দিকে মুখ ফিরাতে হয়, তবে বুক কিবলামুখি থাকবে।

আযানের জবাব

আযান শ্রবণকারীর উপর আযানের জবাব দেওয়া সুন্নাত। মুয়াযযিন যা বলবেন, শ্রোতা তা উচ্চারণ করে জবাব দিবেন। প্রতিধ্বনি করবেন। যেমন মুয়াযযিন اللهُ أَكْبَرُ বলা শেষ করলে শ্রোতা অনুচ্চ আওয়াজে আল্লাহু আকবার বলবেন। أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ বললে- শ্রোতা তা বলবেন এবং সাথে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'

যোগ করবেন। কারণ মহানবি (সা.) এর নাম উচ্চারিত হলে দরুদ পড়তে হয়। মুয়াযযিন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ও حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ বললে শ্রোতা বলবেন لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ। অন্য বাক্যগুলো মুয়াজ্জিনের ন্যায় বলবেন। আযানের জবাব দেওয়া প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি আযানের জবাবে অনুরূপ বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (মুসলিম)

আযানের দোয়া

আযান শেষ হলে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে হয়:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ

الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ-

অর্থ: 'হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং এই শাশ্বত নামাযের তুমিই প্রভু। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে দান করো সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান, সুমহান মর্যাদা এবং বেহেশতের শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত করো, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। কেয়ামতের দিন আমাদেরকে তাঁর শাফাআত নসিব করো। নিশ্চয় তুমি ভঙ্গ কর না অঙ্গীকার।'

ইকামত

ইকামত অর্থ দাঁড় করানো, প্রতিষ্ঠা করা। নামাযের জামাআত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আযানের বাক্য দ্বারা নামায আরম্ভ হওয়ার কথা ঘোষণা করাকে ইকামত বলে। ইকামতের মাধ্যমে মুসল্লিদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, জামাআত শুরু হচ্ছে, সবাই দাঁড়িয়ে যান, কাতার সোজা করুন। ইকামত আযানের মতোই। তবে ইকামতে দুইবার حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পর قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (নামায শুরু হয়েছে) দুই বার বলতে হয়। ইকামত শেষে নিয়ত করে দুহাত কান বরাবর উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে নাভির নিচ বরাবর হাত বেঁধে সালাত শুরু করতে হয়।

বিভিন্ন প্রকার সালাত

সালাতুল বিতর

'বিতর' আরবি শব্দ। এর অর্থ বেজোড়। এ সালাত তিন রাকাআত বিধায় এটিকে বিতর বলা হয়। এশার সালাতের পর তিন রাকাআত বিতর সালাত আদায় করা ওয়াজিব।

বিতর সালাত পড়ার নিয়ম

অন্যান্য ফরয সালাতের ন্যায় দুই রাকাআত সালাত পড়ে তাশাহহুদ পড়তে হয়। এরপর তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহার পর কোনো সূরা বা আয়াত পড়তে হয়। কিরাআত শেষ করার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কান পর্যন্ত উঠাতে হয়। তারপর হাত বেঁধে চুপে চুপে দোয়া কুনুত পড়তে হয়। দোয়া কুনুত শেষে রুকুতে যেতে হয়। তারপর যথারীতি দুই সিজদার পর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে বিতর সালাত সমাপ্ত করতে হয়।

দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ

وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ

وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমরা আপনার সাহায্য চাই, আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, আপনার ওপর আমরা ইমান এনেছি এবং আপনার ওপরই ভরসা করি, আর আপনার উত্তম প্রশংসা করি এবং আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আপনার প্রতি অকৃতজ্ঞ হই না, যারা আপনার নাফরমানি করে, আমরা তাদের ত্যাগ করি এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদাত করি, আপনার উদ্দেশ্যেই সালাত পড়ি এবং আপনাকেই সিজদাহ করি। আপনার দিকেই ধাবিত হই এবং আপনার হুকুম পালনের জন্যই সদা সচেষ্ট থাকি। আমরা আপনার রহমতের আশা করি, আর আপনার শাস্তিকে ভয় পাই। নিঃসন্দেহে আপনার আযাব তো কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত।

সালাতুল জুমুআ

উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠ দিন হলো জুমুআর দিন। আর এই দিনের শ্রেষ্ঠ ইবাদাত হলো জুমুআর সালাত। জুমুআ শব্দের শাব্দিক অর্থ একত্রিত হওয়া, কাতারবদ্ধ হওয়া, সমবেত হওয়া ইত্যাদি। শুক্রবারে সকল মুসলমান একত্রিত হয়ে যুহরের সালাতের পরিবর্তে জামাআত সহকারে যে সালাত আদায় করে তা হলো জুমুআর সালাত।

জুমুআর সালাতের গুরুত্ব

জুমুআর সালাত আদায় করা ফরয। কেউ যদি এই সালাতকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফির বলে পরিগণিত হবে। বিনা ওযরে কেউ যদি পর পর তিন জুমুআ বাদ দেয় তাহলে সে আল্লাহর কাছে মুনাফিক হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। এই সালাতের অনেক ফযিলত রয়েছে। সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

অর্থ: 'হে মুমিনগণ! জুমুআর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করো, এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি করো।' (সূরা জুমূ'আ, আয়াত-৯)

জুমুআর দিনের তাৎপর্য প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, 'সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিনই সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনেই আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং এই দিনেই তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়ায় পাঠানো হয় এবং এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।' (বুখারি) জুমুআর দিনে দোয়া কবুলের সম্ভাবনা বেশি। হযরত ফাতিমা (রা.) শুক্রবার দিনের শেষ ভাগে আসরের পর কাজকর্ম ছেড়ে আল্লাহর যিকর ও দোয়ায় শামিল হতেন। এদিনে আসর হতে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে দোয়া কবুল হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে।

জুমুআর সালাত আদায়ের নিয়ম

ইসলামে জুমুআর সালাত আদায়ের প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেমন মহানবি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পর পর তিন জুমুআর সালাত পরিত্যাগ করে, তার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয় এবং তার অন্তরকে মুনাফিকের অন্তরে পরিণত করে দেওয়া হয় (তিরমিযি)।

জুমুআর দিনে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাআত তাহিয়্যাতুল অযু ও দুই রাকাআত দুখুলুল মসজিদ নফল সালাত আদায় করে চার রাকাআত কাবলাল জুমুআর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় করতে হয়। এর পর ইমাম সাহেব মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে সময় উপযোগী খুতবা (ভাষণ) প্রদান করেন। মুসল্লিদের জন্য এই খুতবা শোনা ওয়াজিব। এই সময় কথা বলা নিষেধ। খুতবা শেষে ইমামের পিছনে দুই রাকাআত ফরয সালাত আদায় করতে হয়। কোনো কারণে জুমুআর সালাতে শরিক হতে না পারলে যোহরের সালাত আদায় করতে হয়।

জুমুআর দিনের আদব

১. জুমুআর দিনে ইবাদাতের নিয়তে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করা।
২. মসজিদে যাওয়ার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা।
৩. নখ কাটা।
৪. সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা।
৫. জুমুআর দিবসে বেশি করে দরুদ পড়া।

সালাতুল জানাযা

জানাযা শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ হলো খাট বা খাটিয়া, খাটিয়ার উপর দাফন কাফনের জন্য রক্ষিত লাশ। সালাতুল জানাযা হলো এক বিশেষ সালাত যা মৃত মুসলমানকে কবর দেওয়ার আগে অনুষ্ঠিত হয়। শরিয়তের দৃষ্টিতে জানাযার সালাত 'ফরযে কেফায়া'। সমাজের কিছুসংখ্যক লোক আদায় করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। কিন্তু কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হবে। এই সালাতের মধ্যে রুকু ও সেজদা করার বিধান নেই। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া জানাযার সালাত বসে আদায় করার সুযোগ নেই।

জানাযা সালাতের ফরয ২টি

১. তাকবির তথা اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর) চারবার সরবে উচ্চারণ করা।

২. দণ্ডায়মান হয়ে সালাত আদায় করা।

জানাযা সালাতের ওয়াজিব ১টি

১. তাকবিরের পর ডানে ও বামে দুবার সালাম বলে সালাত শেষ করা।

জানাযা সালাতে সুন্নাত ৩টি

১. হামদ ও সানা পড়া।

২. দরুদ শরিফ পড়া।

৩. মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা।

জানাযা সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

জানাযা সালাত মূলত মৃত ব্যক্তির প্রতি জীবিতদের পক্ষ থেকে বিশেষ দোয়া। ইসলামি শরিয়তে জানাযা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। জানাযা সালাতে মৃত-জীবিত, উপস্থিত, অনুপস্থিত নারী-পুরুষ সবাইকে দোয়ার মধ্যে শামিল করা হয়। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযার সালাত আদায় করবে, তখন তার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করবে।' (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) জানাযা সালাতে শুধু মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয় না বরং জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলে উপকৃত হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে তার জন্য এক কিরাত (অসংখ্য সাওয়াব) আর যে ব্যক্তি দাফন কার্য সম্পাদন হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবে তার জন্য দুই কিরাআত (অসংখ্য সাওয়াব) রয়েছে।' (তিরমিযি) উল্লেখ্য, একেকটি কিরাত হলো উহুদ পাহাড় পরিমাণ। সুতরাং আমরা জানাযা সালাত আদায় করে অসংখ্য সাওয়াব লাভের চেষ্টা করব।

জানাযা সালাত আদায়ের নিয়ম

মৃত ব্যক্তির মুখ কিবলার দিকে রেখে ইমাম বুক বরাবর দাঁড়াবে। তারপর মনে মনে নিয়ত করতে হবে। প্রথম তাকবির বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হাত বাঁধবে। অতঃপর সানা পড়বে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন 'ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা' এর পর 'ওয়া জাল্লা সানা উকা' বাক্যটি পড়া হয়। সানা শেষ হলে হাত বাঁধা অবস্থায়

দ্বিতীয় তাকবির বলে দরুদ শরিফ পড়বে।

এরপর আবার তৃতীয় তাকবির বলে নিম্নের দোয়াটি পড়বে:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগিরিনা ওয়া কাবিরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা। আল্লাহুম্মা মান আহয়িয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলামি ওয়ামান তাওয়াফ্ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ ফাহু আলাল ইমান।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, আমাদের মৃত, আমাদের মধ্যে উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আমাদের মধ্যে ছোট ও বড়, আমাদের মধ্যে নারী ও পুরুষ সকলকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ ! আপনি আমাদের মধ্যে যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন তাদেরকে ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রাখুন এবং আপনি যাদেরকে মৃত্যু দিবেন তাদেরকে ইমানের ওপর মৃত্যু দান করুন।'

এরপর চতুর্থ তাকবির বলে ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।

সালাতুল ঈদাইন

ঈদ আরবি শব্দ। এর অর্থ আনন্দ, খুশি, উৎসব ইত্যাদি। ঈদের দিন হলো মুসলমানদের জন্য এক আনন্দ ও উৎসবের দিন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের দিন আছে। আর আমাদের উৎসব হলো ঈদ।' (বুখারি ও মুসলিম)

বছরে দুটি ঈদ- ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। ঈদের দিন এলাকার মুসল্লিগণ একত্রে ঈদগাহে সমবেত হন এবং দুই রাকাআত ঈদের সালাত আদায় করে। ঈদের দিন বিশ্বের সকল মুসলিম পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহে গিয়ে ছোট-বড়, আমির-ফকির একই কাতারে দাঁড়িয়ে এই বিশেষ ইবাদাত পালন করে থাকেন।

ঈদের সালাত আদায়ের নিয়ম

ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের সালাত আদায় করা যায়। ঈদের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করতে হয়। প্রথমে কাতার করে নিয়ত করবে। তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধবে। সানা পড়বে। তারপর ইমাম সাহেবের সাথে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবে। প্রত্যেক তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠবে। প্রথম দুই তাকবিরে হাত বাঁধবে না। তৃতীয় তাকবিরে অন্যান্য সালাতের মতো হাত বাঁধবে। ইমাম সাহেব স্বাভাবিক নিয়মে প্রথম রাকাআত শেষ করে দ্বিতীয় রাকাআতের রুকুতে যাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলবেন। মুসল্লিরাও তার সাথে তাকবির বলবে। তাকবিরে কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে ছেড়ে দেবেন, হাত

বাঁধবে না। চতুর্থ তাকবিরে রুকুতে যাবে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে সালাত শেষ করবে। সালাত শেষে ইমাম সাহেব দুটি খুতবা দেবেন। প্রত্যেক মুসল্লির জন্য খুতবা শোনা ওয়াজিব। ঈদের মাঠে যাবার পথে ঈদুল আযহার তাকবির ঈদুল ফিতরের তাকবিরের অনুরূপ। আর ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি একই, শুধু নিয়তের বেলায় আলাদা নিয়ত করতে হবে।

ঈদের সালাতের সামাজিক প্রভাব

ঈদ মানে মহা আনন্দের আয়োজন। ঈদ আমাদের সমাজ সংস্কৃতির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ঈদ ধর্মীয় উৎসব হলেও এটি এখন সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। ঈদের দিন পরিবারের যে যেখানেই থাকুক না কেন, সবাই একত্র হয়ে থাকে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার এটাই সর্বোত্তম সুযোগ। ঈদের দিন মুসলমানরা একে অপরের খোঁজখবর নেয় ও একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে থাকে। ধনী-গরিব সবাই সকল প্রকার দুঃখ ভুলে আনন্দে থাকার চেষ্টা করে। সকল ভেদাভেদ ভুলে সবাই একত্র হয়। ঈদের দিন পুরুষরা দলে দলে ঈদগাহে যায়। ছোট ছোট শিশুরা বাবা, ভাই ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে নতুন জামাকাপড় পড়ে ঈদগাহে যায়। সবার মধ্যে এক আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি হয়। জামাআতবদ্ধ হয়ে সবাই নামাজ আদায় করে। নামাজ শেষে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে। ঈদগাহে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও এলাকার সকলের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সুযোগ পায় সবাই। এর মধ্য দিয়ে সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি হয়। গরিব ও অসহায়েরা বিভিন্ন সমস্যার কথা উপস্থিত মুসল্লিদের বলার সুযোগ পায় ও প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে থাকে। ঈদের দিন সবাই আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়িতে যায়। কুশল বিনিময় করে থাকে। এর মধ্যে দিয়ে আত্মীয়ের বন্ধন দৃঢ় হয়। ঈদের দিন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের বাসায় একে অপরে খাওয়া-দাওয়া করে থাকে। যার মধ্যে দিয়ে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় ও মজবুত হয়।

সালাতুল তারাবিহ

তারাবিহ আরবি শব্দ। এর অর্থ বিশ্রাম করা, আরাম করা। শরিয়তের পরিভাষায় রমযান মাসে এশার সালাতের পর অতিরিক্ত ২০ রাকাআত সুন্নাত সালাতকে 'সালাতুত তারাবিহ' বলা হয়। এ সালাতকে তারাবিহ নাম রাখা হয়েছে এ কারণে যে, এতে প্রতি চার রাকাআত অন্তর কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেওয়া হয়। এ সালাত সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। নবি করিম (সা.) নিজে এ সালাত আদায় করেছেন ও সাহাবিগণকে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তারাবিহ-এর সালাত জামাআতে আদায় করা সুন্নাত।

তারাবিহর সালাত আদায়ের নিয়ম

রমযান মাসে এশার চার রাকাআত ফরয ও দুই রাকাআত সুন্নাতের পর বিতর নামাযের পূর্বে তারাবিহের নিয়তে দুই রাকাআত দুই রাকাআত করে মোট বিশ রাকাআত সালাত আদায় করতে হয়। প্রতি চার রাকাআত পর পর বিশ্রাম নিতে হয়। তখন বিভিন্ন তাসবিহ পড়া যায়। এসময় নিম্নের দোয়াটিও পড়া যায়:

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

উচ্চারণ: সুবহানাযিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানাযিল ইযযাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারুত। সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যিল্লাযি লা-ইয়ানামু ওয়ালাইয়ামুতু আবাদান আবাদা। সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়ারাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ।

অর্থ: 'আমি একমাত্র সেই প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি, যিনি রাজাধিরাজ এবং ফেরেশতাগণের অধিপতি। আমি তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভাব এবং গৌরবের মালিক। আমি সেই চিরঞ্জীব আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি কখনও ঘুমান না এবং কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। তিনি পবিত্রতম, আমাদের প্রতিপালক, ফেরেশতাকুল ও জিবরাইল (আ.)-এর প্রতিপালক।'

তারাবিহের সালাত শেষ করে বিতরের সালাত রমযান মাসে জামাআতে আদায় করার বিধান রয়েছে।

তারাবিহ সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

মাহে রমযানে তারাবিহ নামায আদায় করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা মাহে রমযানের রোযা ফরজ করেছেন এবং রাতে তারাবিহ নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে পুণ্যের কাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

পবিত্র রমযান মাস রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস। পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় হলো রমযান মাস। সারাদিন সাওম (রোযা) পালনের পর বান্দা যখন ক্লান্ত শরীরে তারাবিহের বিশ রাকাআত সালাত আদায় করে তখন আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হন। বান্দার জন্য এমন সুযোগ বছরে মাত্র একমাসেই আসে। তাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আল্লাহর রহমত পেতে ব্রতী হন। এ প্রসঙ্গে নবি করিম (সা.) বলেন,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে প্রতিদানের আশায় রমযানে (তারাবিহের) সালাত আদায় করবে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' (বুখারি)

তারাবিহের সালাত ছোট ছোট সূরার মাধ্যমেও আদায় করা যায়। আবার কুরআন খতমের মাধ্যমেও আদায় করা যায়। তারাবিহ-এর বিশ রাকাআতে পবিত্র কুরআন ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াত করে পূর্ণ কুরআন সমাপ্ত করাই নিয়ম। তবে মনে রাখতে হবে যে, সূরাগুলো স্পষ্ট, ধীরস্থির ও শুদ্ধভাবে পড়তে হবে। রমযান মাসে

তারাবিহের সালাত একত্রিত হয়ে জামাআতে আদায় করা উত্তম। এতে নামাযে ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। দীর্ঘ একটি মাস পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের ফলে পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, মমত্ববোধ, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে, হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। অতএব, ফজিলতপূর্ণ এ নামায রমযানের পুণ্যময় সময়ে জামাআতের সাথে আদায় করা প্রত্যেক ইমানদার মুসলমানের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর।

দলগত কাজ :

তারাবিহ নামায জামাআতে আদায় করলে ভুল কম হয়-এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

মাসবুকের সালাত

যে মুক্তাদি ইমামের সাথে সালাতের প্রথম রাকাআত থেকে পায় নি, তাকে মাসবুক (পিছে পড়া) বলে। মাসবুক ব্যক্তি জামাআতে সালাত আদায় করতে গিয়ে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, সে অবস্থাতেই নিয়ত করে নামাযে অংশগ্রণ করবে। তারপর ইমামের সাথে সে নামায পড়তে থাকবে এবং যথারীতি রুকু সিজদাহ করে তাশাহহুদ পাঠের জন্য শেষ বৈঠকে বসে যাবে এবং 'আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু' পর্যন্ত পড়ে অপেক্ষা করবে। ইমাম সালাম ফিরালে মাসবুক ব্যক্তি সালাম না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া রাকাআতগুলো যথারীতি আদায় করবে। অবশিষ্ট সালাতে তার নিজের ভুল হলে সাহু সিজদাহও করতে হবে।

প্রথমে কিরাআতওয়ালা রাকাআত অর্থাৎ সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলানো রাকাআত এবং পরে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। তারপর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করবে।

রুকুসহ ইমামের সথে যে কয় রাকাআত পাওয়া যায় তা আদায় হয়ে যায়। রুকুর পর ইমামের পেছনে ইক্তেদা বা নামাযে দাঁড়ালে ঐ রাকাআত মাসবুককে আদায় করতে হবে।

মুক্তাদির সালাত এক, দুই, তিন, চার রাকাআত ছুটে গেলে, তা আদায়ে কিছুটা তারতম্য রয়েছে।

মুক্তাদি ইমামের পেছনে ইক্তেদা করার পর যদি এক রাকাআত ছুটে যায়, তবে ইমামের সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া এক রাকাআত সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে আদায় করে নেবে।

দুই রাকাআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া দুই রাকাআত যথানিয়মে আদায় করবে, যেভাবে ফজরের দুই রাকাআত ফরয সালাত একাকী আদায় করা হয়।

তিন রাকাআত ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। এক রাকাআত সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে আদায় করে প্রথম বৈঠক করবে। এ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর আবার দাঁড়িয়ে যাবে

এবং বাকি দুই রাকাআতের প্রথম রাকাআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা মিলিয়ে আদায় করবে এবং পরের রাকাআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। এরপর শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।

চার রাকাআত ছুটে গেলে অর্থাৎ মুক্তাদি ইমামকে শেষ বৈঠকে পেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর সে একাকী চার রাকাআত নামায পড়লে যেভাবে পড়ত, ঠিক সেভাবে চার রাকাআত নামায আদায় করবে।

চার, তিন, দুই রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে মুক্তাদি ইমামকে শেষ বৈঠকে পেলে ইমামের সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদি দাঁড়িয়ে যাবে। যথানিয়মে ছুটে যাওয়া রাকাআতগুলো এমনভাবে আদায় করে নেবে, যেভাবে একজন মুসল্লি একাকী চার, তিন, দুই রাকাআত বিশিষ্ট সালাত আদায় করে থাকে।

দলগত কাজ

কোনো একজন শিক্ষার্থী জোহরের নামায আদায় করতে মসজিদে গিয়ে ইমামের সাথে এক রাকআত পেয়েছে। অবশিষ্ট নামায কীভাবে আদায় করবে? শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয। শরিয়ত সমর্থিত ওযর ব্যতীত সালাত পরিত্যাগ করা যাবে না। রুগ্ণ ব্যক্তি যথানিয়মে সালাত আদায় করতে না পারলে, তার জন্য ইসলামে সহজ নিয়মের অনুমোদন রয়েছে। রোগীর সেই সহজ নিয়মে সালাত আদায়কে রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত বলে।

রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত আদায়ের নিয়ম

রুগ্ণ ব্যক্তির জন্য জ্ঞান থাকা পর্যন্ত সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। রোগ যত কঠিন হোক না কেন, সম্পূর্ণরূপে অপারগ না হলে সালাত ত্যাগ করা যাবে না। যথাসম্ভব ওয়াক্তের মধ্যেই নামায আদায় করতে হবে। নামাযের সমুদয় আরকান-আহকাম যথাযথভাবে আদায় করতে অপারগ হলে ইশারায় হলেও ওয়াক্তের মধ্যেই নামায আদায় করতে হবে।

রোগীর দাঁড়াতে কষ্ট হলে বসে রুকু-সিজদাহর সাথে সালাত আদায় করবে। রুকু-সিজদাহ করতে অক্ষম হলে বসে ইশারায় সালাত আদায় করবে। রুগ্ণ ব্যক্তিকে বসার সময় সালাতের অবস্থায় বসতে হবে। যদি রোগী এতই দুর্বল হয় যে বসে থাকা সম্ভব নয়, তবে কিবলার দিকে পা দুটি রাখতে হবে। পা সোজা না রেখে হাঁটু উঁচু করে রাখতে হবে এবং মাথার নিচের বালিশ বা এ-জাতীয় কিছু জিনিস রেখে মাথা একটু উঁচু রাখতে হবে। শুয়ে ইশারায় রুকু ও সিজদাহ করবে অথবা উত্তর দিকে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে এবং কিবলার দিকে মুখ রেখে

ইশারায় সালাত আদায় করবে। যদি এভাবেও সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে যেভাবে সম্ভব সেভাবে সালাত আদায় করতে হবে।

অপারগ অবস্থায় বা কেউ বেহুঁশ হয়ে পড়লে যদি চব্বিশ ঘণ্টা সময় অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বা তার চেয়ে কম সময় অতিক্রান্ত হয়, তাহলে সক্ষম হওয়ার পর রুগ্‌ণ ব্যক্তিকে ধারাবাহিকভাবে কাযা করতে হবে। যদি পাঁচ ওয়াক্তের বেশি সময় অতিবাহিত হয়, তবে আর ধারাবাহিকভাবে কাযা করতে হবে না। যথাসময়ে এ নামায আদায় না করতে পারার জন্য মহান আল্লাহর নিকট তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

নামাযরত অবস্থায় কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে, দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে পড়তে হবে, বসে না পারলে শুয়ে বা ইশারা করে বাকি নামায আদায় করতে হবে।

দলগত কাজ

রুগ্‌ণ ব্যক্তির নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

মুসাফিরের সালাত

'মুসাফির' আরবি শব্দ। এর অর্থ সফরকারী। কোনো ব্যক্তি তার অবস্থানস্থল থেকে ৪৮ মাইল তথা ৭৮ কিলোমিটার দূরে সফর করার নিয়তে বের হয়ে নিজ শহর বা গ্রাম পেরিয়ে গেলেই তিনি মুসাফির হয়ে যান। আর এ অবস্থায় গন্তব্যস্থলে কমপক্ষে ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়ত না করা পর্যন্ত মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন। এর বেশি অবস্থান করলে সে ব্যক্তি মুকিম বা স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে গণ্য হবেন।

মানুষের জীবনে সফর কিংবা ভ্রমণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ যখন নিজের আবাসস্থলে থাকে, তখন পূর্ণাঙ্গ সালাত আদায় করতে হয়। কিন্তু ভ্রমণে বা সফরে মুসাফির অবস্থায় যোহর, আসর ও এশার ফরজ সালাত কসর করতে হয়। 'কসর'-এর অর্থ হলো কম করা বা সংক্ষেপ করা। কসর আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক ধরনের সুবিধা। শরিয়ত নির্ধারিত দূরত্বে সফর করা কালে সালাত সংক্ষেপ করা ইসলামের বিধান। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা যখন ভূ-পৃষ্ঠে সফর করবে, তখন তোমাদের জন্য সালাতের কসর করায় কোনো দোষ নেই।' (সূরা আন নিসা, আয়াত: ১০১)

মুসাফিরের সালাত আদায়ের পদ্ধতি

মুসাফির ব্যক্তি চার রাকাআত বিশিষ্ট যোহর, আসর ও এশার ফরয সালাত দুই রাকাআত পড়বেন। কসর শুধু চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয সালাতেই হয়ে থাকে। অতএব, মাগরিব, ফজর এবং সুন্নাত ও বিতরের সালাতে কোনো কসর নেই। আর এইভাবে সংক্ষেপে সালাত আদায়ের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা কল্যাণ রেখেছেন। মুসাফির চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয সালাত একাকী পড়লে বা মুসাফির ইমামের পেছনে আদায় করলে, কসর করবে। এ ক্ষেত্রে পূর্ণ নামাজ পড়া ঠিক নয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের

নবির মুখে সালাতকে মুকিম অবস্থায় চার রাকাআত ও সফর অবস্থায় দুই রাকাআত ফরয করেছেন।' (মুসলিম) মুসাফির ব্যক্তি সফর অবস্থায় ইচ্ছাকৃত চার রাকাআত সালাত পূর্ণ করবে না। কিন্তু মুকিম ইমামের পেছনে ইকতিদা করলে ইমামের অনুসরণ করে পূর্ণ সালাত আদায় করবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'মুসাফির যদি মুকিম ইমানের সঙ্গে সালাতে শরিক হয়, তবে সে যেন তাদের মতো চার রাকাআত সালাত পড়ে।' (ইবনে আবি শাইবা) মুসাফির ইমামতি করলে মুক্তাদিদের আগেই বলে দেবে যে, সে মুসাফির এবং দুই রাকাআত পড়ে সালাম ফিরাবে আর মুকিম মুক্তাদিগণ দাঁড়িয়ে বাকি দুই রাকাআত সালাত আদায় করে নেবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) সফর অবস্থায় সর্বদা সালাত কসর করেছেন। মুসাফির ব্যক্তির জন্য চলন্ত অবস্থায় সুন্নাত না পড়ার সুযোগ রয়েছে। তবে মুকিম অবস্থায় সুন্নাত সালাত আদায় করবে।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

ইসলাম সময় ব্যবস্থাপনার ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করে। ইসলামে অনেক ইবাদাত ও আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে যা সরাসরি সময়ের সাথে সম্পর্কিত এবং সেগুলো নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই পালন করতে হয়। ইসলামের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি এবং অপরিহার্য ইবাদাত-সালাত আদায়ের জন্যও সুনির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। মহানবি (সা.) এর হাদিসে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত আদায়ের উত্তম সময় সম্পর্কে যেমন নির্দেশনা রয়েছে তেমনি সালাতের নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কেও নির্দেশনা রয়েছে। সালাতের নিষিদ্ধ সময় তিনটি। আর তা হলো:

১. সূর্যোদয়ের সময়;
২. দ্বিপ্রহরের সময় এবং
৩. সূর্যাস্তের সময়।

এ সময়গুলোতে সাধারণত সালাত আদায় করা নিষেধ। তবে কোনো কারণে কেউ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ দিনের আসরের সালাত আদায় করতে না পারে তবে তা আদায় করা যাবে কিন্তু মাকরূহ হবে। এ নিষিদ্ধ সময় প্রসঙ্গে সাহাবি উকবা ইবনে আমের জুহানী (রা.) বলেন, 'তিনটি সময়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সালাত আদায় করতে এবং মৃতদের দাফন করতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময়; যতক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থানের সময় থেকে শুরু করে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তা হলুদাভ হওয়া থেকে শুরু করে যতক্ষণ না তা পুরোপুরি অস্ত যায়।' (মুসলিম)

সাহু সিজদাহ

সাহু শব্দের অর্থ হলো ভুলে যাওয়া। সাহু সিজদাহ অর্থ ভুল সংশোধনমূলক সিজদাহ। সালাতের কার্যক্রমে ভুলক্রমে কোনো ওয়াজিব বাদ পড়লে যেমন রাকাআত সংখ্যা ভুলে কম-বেশি হয়ে গেলে তা সংশোধনের জন্য সালাতের শেষ বৈঠকে দুটি সিজদাহ দেওয়া ওয়াজিব। শরিয়তের দৃষ্টিতে এই রকম সিজদাই হলো সাহু সিজদাহ। রাসুল (সা.) সালাতের ভুল সংশোধনের জন্য এই রকম আমল করেছেন যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

সাহু সিজদাহ ওয়াজিব হওয়ার কারণ

১. সালাতের কোনো ওয়াজিব ভুলক্রমে ছুটে গেলে।

২. কোনো ওয়াজিব পুনরায় বা দুইবার আদায় করা হলে।

৩. সালাতের কোনো ওয়াজিব যথাযথভাবে আদায় না করা যেমন রুকু থেকে সাজদাহ বিলম্বে আদায় করলে।

৪. ভুলক্রমে কোনো ফরয দুইবার আদায় করা হলে।

৫. কোনো ওয়াজিব পরিবর্তন হলে। যেমন, যে সালাতে ক্বিরাত প্রকাশ্যে পড়ার বিধান সেই সালাতে গোপনে ক্বিরাত পড়া। অপরপক্ষে যে সালাতে ক্বিরাত গোপনে পড়তে হয়, সেই সালাতে প্রকাশ্যে ক্বিরাত পড়া।

৬. সালাতের ফরযসমূহ আদায় করতে গিয়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করা। যেমন কোনো ফরযকে এগিয়ে আনা আবার কোনো ফরযকে পিছিয়ে দেওয়া।

সাহু সিজদাহ আদায়ের নিয়ম

সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু শুরু করে 'আবদুহু ওয়া রাসুলুহু' পর্যন্ত পড়ে ডান দিকে সালাম ফিরাতে হয়। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে দুটি সিজদাহ আদায় করতে হয়। উল্লেখ্য, সিজদাহ দুটিতে নিয়ম অনুযায়ী তাসবিহ পড়তে হয়। এরপর বসে যথানিয়মে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু), দরুদ শরিফ ও দোয়া মাসুরা পড়ে দুই দিকে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করতে হয়।

সালাত সংশ্লিষ্ট তাসবিহ ও দোয়াসমূহ

সালাতের প্রয়োজনীয় দোয়াসমূহ

সালাত আদায়ের সময় অনেকগুলো দোয়া এবং তাসবিহ পড়তে হয়। তার মধ্য থেকে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো। আমরা এইগুলো শিখব এবং সালাতে নির্দিষ্ট জায়গায় তা পাঠ করব।

১. **নামাযের পূর্বপ্রস্তুতির দোয়া:** ওযু করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার সময় আল্লাহ তা'আলাকে উপস্থিত জেনে পড়তে হবে:

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

অর্থ: 'আমি পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ৭৯)

২. **সালাতের নিয়ত:** এরপর নিয়ত করতে হবে। ‘নিয়্যাত’ আরবি শব্দ। এর অর্থ ইচ্ছা করা, সংকল্প করা ইত্যাদি। কোনো কিছু করার জন্য মনে মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকেই নিয়ত বলে। নির্দিষ্ট কোনো বাক্যের মাধ্যমে সালাতের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়, মনে মনে নিয়ত করলেই হবে। তবে মনসংযোগের জন্য অনুচ্চ আওয়াজে মুখে আওড়ানো যেতে পারে।

৩. **সানা:** তাকবিরে তাহরিমা ‘আল্লাহু আকবার’ বলে হাত বাঁধার পর এই সানা পড়তে হবে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ إِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা‘আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা করছি, আপনার নাম বরকতময়, আপনার মর্যাদা অতি উর্ধ্বে। আপনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই।’

৪. **তাকবিরে তাহরিমা**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার

অর্থ: আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

৫. **রুকুর তাসবিহ**

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ: সুবহানা রাব্বিয়্যাল আযীম

অর্থ: আমি আমার রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

৬. **রুকু থেকে ওঠার তাসবিহ**

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: রাব্বানা লাকাল হামদ

অর্থ: হে আমাদের রব! যাবতীয় প্রশংসা আপনারই জন্য।

৭. **রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো অবস্থার তাসবিহ**

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

উচ্চারণ: সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করেন, তিনি তা শোনেন।

৮. **সিজদাহর তাসবিহ**

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

উচ্চারণ: সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা

অর্থ: পবিত্রতা ঘোষণা করছি আমার মহান রবের।

৯. তাশাহহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সলাওয়াতু ওয়াত্‌তাইয়েবাতু, আস্‌সালামু আলাইকা আইয়ুহান্‌নাবিয়্যু ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্‌ সলেহীন, আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ।

অর্থ: 'সমুদয় প্রশংসা, সব ইবাদাত ও সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবি! আপনার ওপর সালাম আর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসুল।'

১০. দরুদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ–

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিঁ ও‘আলা আলি, মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিমা ও‘আলা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম্-মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক ‘আলা মুহাম্মাদিঁ ও‘আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা ‘আলা ইব্রাহিমা ও‘আলা আলি ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম্-মাজিদ।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদের পরিজনের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেমনিভাবে ইবরাহিম এর পরিজনের ওপর আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, মর্যাদাবান। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ-এর প্রতি এবং মুহাম্মদের পরিজনের প্রতি বরকত বর্ষণ করুন। যেমনিভাবে আপনি বরকত বর্ষণ করেছেন ইবরাহিম -এর পরিজনের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত, মর্যাদাবান। (বুখারি)

১১. দোয়া মাসুরা

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফসি যুলমান কাসিরা। ওলা ইয়াগ ফিরুজ্-জুনুবা ইল্লা আনতা। ফাগফির লি, মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা; ওয়ার হামনি, ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহিম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া সে অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। আপনি নিজ অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (বুখারি)

আদর্শ জীবন গঠনে সালাতের ভূমিকা

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে সালাত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। ইমানের পরই সালাতের স্থান। মহান আল্লাহ তা‘আলার নিকট বান্দার বিনয় ও অনুগত্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হলো সালাত। সালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্যের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম বান্দার কাছে সালাতের হিসাব চাইবেন।

সালাত নিত্যপালনীয় একটি ফরয ইবাদাত হলেও আদর্শ জীবন গঠনে এর সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। আদর্শ জীবন বিনির্মাণে অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলি সালাত আদায়ের মাধমে অর্জন করা যায়। পাপাচার, অন্যায় ও অশ্লীলতামুক্ত আদর্শ জীবন গঠনে সালাত সহায়তা করে। সালাত সকল প্রকার পাপাচার ও খারাপ কাজ পরিহার করে সৎ পথে পরিচালিত করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।' (সূরা আল-'আনকাবূত, আয়াত: ৪৫)

সালাত আমাদের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়। জামাআতে সালাত আদায়ের সময় সমাজের উচু-নিচু, ধনী-নির্ধন এবং সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ একত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশাপাশি দাঁড়াতে হয়। এতে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

সালাত আমাদের সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা দেয়। সালাতে রুকু সিজদাহ যথানিয়মে করতে হয়। এতে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার শিক্ষা পাওয়া যায়। আর নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ের মাধ্যমে সকল কাজ সঠিক সময়ে করারও শিক্ষা পাওয়া যায়। নিয়মিত সালাত আদায়কারী সাধারণত কর্তব্য পালনে অবহেলা করে না।

অত্যন্ত বিনীত ও নম্রভাবে একাগ্রচিত্তে সালাত আদায় করতে হয়। একাগ্রতাবিহীন সালাত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। সালাত আদায়ের সময় মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হয় মহান আল্লাহ তাকে দেখছেন। এভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমে অর্জিত বিনয় ও একাগ্রতা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে আদর্শ জীবন গঠন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আল্লাহর যে সকল বান্দা এভাবে বিনয়-নম্রতা ও বিনম্র-একাগ্রতা নিয়ে সালাত আদায় করে তাদের সফলতা অবশ্যম্ভাবী। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন:

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ

অর্থ: 'অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছেন, যারা নিজেদের সালাতে বিনয় ও নম্র।' (সূরা মু'মিনূন, আয়াত: ১-২)

জামাআতে সালাত আদায় করলে মুসলিমগণ দৈনিক পাঁচবার একত্র হওয়ার সুযোগ পান। এ সময় একে অপরের খোঁজখবর নিতে পারেন। অসহায় ও দরিদ্রকে সাহায্য-সহযোগিতা করা যায়। এতে সকলের সাথে সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। এ রকম আরও অনেক উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনে সালাত প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখে।

তাই বলা যায় আদর্শ জীবন গঠনে সালাতের ভূমিকা অপরিসীম। আমরা নিয়মিত সঠিকভাবে সালাত আদায় করব এবং জীবনকে সুন্দর ও আদর্শময় করে গড়ে তুলব।

তাহলে এতক্ষণ আমরা সালাত সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম, শিখলাম। ষষ্ঠ শ্রেণিতেও আমরা সালাত সম্পর্কে জেনেছি। এখন তাহলে আমরা সালাত সম্পর্কিত আমাদের সকল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। কিভাবে জানো? এবার শিক্ষকের সহায়তায় তোমরা সব বন্ধুরা মিলে একটি ডেমোনস্ট্রেশন বা ডিসপ্লে/মহড়ার আয়োজন করবে। সেখানে শিক্ষকের উপস্থিতিতে কীভাবে সঠিক নিয়মে সালাত আদায় করতে হয় তা তোমরা প্রদর্শন করবে।

সাওম

পরবর্তী পাঠে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষক তোমাদেরকে একটি গল্প বলবেন এবং সেই সাথে কিছু প্রশ্ন করবেন। শিক্ষকের বলা গল্পটি মনোযোগ সহকারে শুনে শিক্ষক যে প্রশ্ন করবেন তার উত্তর চিন্তা করে বের করার চেষ্টা করো। সাওম এবং যাকাতের পাঠের পর তোমরা সম্মিলিতভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করবে। তাই এখন থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে রাখো।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের প্রতিটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার এগুলোর প্রত্যেকটির কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সাওম ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। সাওমেরও রয়েছে কিছু স্বাতন্ত্র্য। প্রিয় শিক্ষার্থী! এ শ্রেণিতে তুমি সাওমের বিস্তারিত ধারণা ও তাৎপর্য, প্রকারভেদ, সাওমের কাযা আদায়ের নিয়ম, সাওমের কাফফারাহ আদায়, সাওম-সংশ্লিষ্ট কতিপয় জরুরি মাসায়েল, ইতিকাফ, সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে জানতে পারবে। অধিকন্তু তুমি মানবতার গুণাবলি বিকাশে সাওমের ভূমিকা জেনে সে অনুসারে জীবন গঠন করতে পারবে। তাহলে শুরু করা যাক নতুন বিষয়ের আলোচনা।

সাওমের ধারণা

'সাওম' আরবি শব্দ। এর ফারসি প্রতিশব্দ হলো রোযা। এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিয়তের সাথে পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোযা বলে। রমযান মাসের রোযা পালন করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের ওপর ফরয। যে তা অস্বীকার করবে সে কাফির হবে। বস্তুত রোযা পালনের বিধান পূর্ববর্তী সকল উম্মতের জন্য অপরিহার্য ইবাদাত ছিল। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

অর্থ: 'হে ইমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হলো, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩)

সিয়াম সাধনার ফলে সমাজের লোকদের মাঝে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়। ধনীরা গরিবদের অনাহারে, অর্ধাহারে জীবনযাপনের কষ্ট অনুধাবন করতে পারে। ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা যে কীরূপ পীড়াদায়ক হতে পারে তা তারা উপলব্ধি করতে পারে। ফলে তাদের মাঝে অসহায় নিরন্ন মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত হয়। এ কারণে তারা দান-খয়রাতে উৎসাহিত হয়। রমযান মাসে রাসুলুল্লাহ (সা.) অন্যদের দান-সাদকা করতে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছেন, তিনি নিজেও তেমনিভাবে অধিক দান-সাদকা করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) লোকদের মধ্যে অধিক দানশীল ছিলেন। বিশেষ করে রমযান এলে তাঁর দানশীলতা আরও বেড়ে যেত।' (বুখারি ও মুসলিম)

রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারি এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন নাযিল হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১৮৫) এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, রমযান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে এটি একটি অতি পবিত্র মাস। হাদিসে কুদসিতে আছে:

اَلصَّوْمُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهٖ

অর্থ: 'রোযা কেবল আমারই জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো।' (বুখারি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'জান্নাতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্য কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না।' (বুখারি) রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমানের সাথে এবং সাওয়াবের আশায় সাওম পালন করে, তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।' (বুখারি ও মুসলিম)।

রমযান মাস ধৈর্যের মাস। আর ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। এ মাসে মুমিনের রিযিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোনো রোযা পালনকারীকে ইফতার করাবে, সে তার রোযার সমান সাওয়াব পাবে। অথচ রোযা পালনকারী ব্যক্তির সাওয়াবের বিন্দুমাত্র ঘাটতি হবে না। ফযিলতের দিক দিয়ে রমযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশ রহমতের, দ্বিতীয় অংশ মাগফিরাতের এবং শেষ অংশ জাহান্নাম থেকে মুক্তির।

রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষ হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, ধূমপানে আসক্তি ইত্যাদি বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে। কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আত্মরক্ষার হাতিয়ার হলো রোযা। রোযা পালনের মাধ্যমে পানাহারে নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। এতে অনেক রোগ দূর হয়। স্বাস্থ্য ভালো থাকে, এবং মনও ভালো থাকে।

সুতরাং আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় এবং এর নানাবিধ গুরুত্ব বিবেচনা করে আমাদের সাওম পালন করা উচিত। আমরা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সাওম পালন করব।

সাওমের (রোযার) প্রকারভেদ

সাওম (রোযা) ছয় প্রকার। যেমন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, নফল ও মাকরূহ।

১. **ফরয রোযা:** রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয। এর অস্বীকারকারী কাফির। রমযানের কাযা রোযা এবং সকল প্রকার কাফফারার রোযাও ফরয।

২. **ওয়াজিব রোযা:** কোনো নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখার মানত করলে সেই দিনের রোযা রাখা ওয়াজিব। যেমন– কেউ মানত করল যে, বৃহস্পতিবার রোযা রাখবে। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট দিনের উল্লেখ না করে রোযা রাখার মানত করলে সেই রোযা রাখাও ওয়াজিব। এমনকি নফল রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেললে তা কাযা করা ওয়াজিব।

৩. **সুন্নত রোযা:** মহানবি (সা.) যে সকল রোযা পালন করেছেন এবং অন্যদের পালন করতে উৎসাহিত করেছেন, সেগুলো সুন্নত রোযা। যেমন আশুরার দিন ও আরাফার দিনে রোযা পালন করা সুন্নত।

৪. **মুস্তাহাব:** প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা পালন করা মুস্তাহাব। এগুলোকে আইয়ামে বীযের রোযা বলা হয়। এ ছাড়া সপ্তাহের প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার এবং শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা পালন করাও মুস্তাহাব।

৫. **নফল রোযা:** ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব ছাড়া সকল প্রকার রোযা নফল। নফল অর্থ অতিরিক্ত। যে সকল দিনে রোযা পালন করা শরিয়তে হারাম ও মাকরুহ ঐ সকল দিন ব্যতীত বছরের অন্য যেকোনো দিন রোযা পালন করা নফল।

৬. **মাকরুহ রোযা:** মাকরুহ দুই প্রকার।

(ক) **মাকরুহ তাহরিমি:** যা মূলত হারাম রোযা। যেমন– দুই ঈদের দিনে ও আইয়ামে তাশরিকের অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে রোযা পালন করা হারাম।

(খ) **মাকরুহ তানযিহি:** মুহাররম মাসের ৯ বা ১১ তারিখে রোযা না রেখে শুধু আশুরার দিন আর্থাৎ ১০ তারিখে রোযা পালন করা মাকরুহ তানযিহি। কারণ, এতে ইয়াহুদিদের সাথে সামঞ্জস্য হয়। অনুরূপভাবে শুধু শনিবার রোযা রাখা। কারণ, এতেও ইয়াহুদিদের সাথে মিল হয়ে যায়। মাকরুহ তানযিহি অর্থ চলনসই অপছন্দনীয় কাজ, যা করলে গুনাহ নেই।

সাহরি

'সাহরি' আরবি শব্দ। এর অর্থ ভোর রাতের খাবার। ইসলামের পরিভাষায়, সাওম পালন করার উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে যে খাবার ও পানীয় গ্রহণ করা হয়, তাকে সাহরি বলে। সাহরি খাওয়া সুন্নাত। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে সাহরি খেতেন এবং অন্যদেরকেও সাহরি খাওয়ার জন্য তাগিদ করতেন। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা সাহরি খাও। কেননা এতে তোমাদের জন্য বরকত রয়েছে।' (বুখারি)

সুবহে সাদিকের আগেই সাহরি খাওয়া শেষ করতে হবে। কোনো কোনো মানুষ মনে করে, আযান না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া জায়েয, এটি একটি মারাত্মক ভুল ধারণা। তবে এত আগেও সাহরি খাওয়া উচিত নয় যে, সাহরি খাওয়ার পর সুবহে সাদিকের অনেক সময় বাকি থাকে। ফলে অনেকে বিশ্রামের জন্য বিছানায় যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। এতে ফজরের সালাত কাযা হয়ে যায়।

ইফতার

ইফতার আরবি শব্দ। এর অর্থ ভঙ্গ করা, ছিঁড়ে ফেলা, রোযা ভঙ্গকরণ। ইসলামি পরিভাষায় নিয়ত সহকারে সূর্যাস্তের পর হালাল বস্তু পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করাকে ইফতার বলা হয়।

রমজান মাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হলো ইফতার। এতে অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। ইফতারের সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা উত্তম। হাদিসে কুদসিতে আছে মহান আল্লাহ বলেন– আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ বান্দাগণ যারা বিলম্ব না করে ইফতার করে। ইফতারের সময় বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা এবং আলহামদুলিল্লাহ বলে শেষ করা উত্তম। তবে নিম্নোক্ত দোয়াটিও পড়া যায়:

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

অর্থ: 'হে আল্লাহ ! আপনার জন্য সাওম পালন করেছি এবং আপনার দেওয়া রিযিক দ্বারাই ইফতার করলাম।' (আবু দাউদ)

অন্যকে ইফতার করানো অনেক সাওয়াবের কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন–'যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে তার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। রোযাদারের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে তবে রোযাদারের সাওয়াবে কোনো কম করা হবে না।' (তিরমিযি)

'সামান্য এক চুমুক দুধ বা একটি শুকনা খেজুর অথবা এক ঢোক পানি দ্বারাও যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে ইফতার করাবে আল্লাহ তাকে রোযাদারের সমপরিমাণ সাওয়াব দান করবেন, আর যে ব্যক্তি কোনো রোযাদারকে পরিতৃপ্তভাবে পানি পান করাবে আল্লাহ তাকে আমার হাওযে কাওসার থেকে এমন পানীয় পান করাবেন, যার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে তৃষ্ণার্ত হবে না।' (তিরমিযি)

আমরা অধিক সাওয়াব ও আল্লাহর রহমতের আশায় সময়মতো ইফতার করব এবং অন্যকে ইফতার করাব।

সাওম ভঙ্গের কারণসমূহ

যেসব কারণে সাওম বা রোযা ভেঙে যায় সেগুলো হলো–

১. ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে বা কেউ জোরপূর্বক কোনো কিছু খাওয়ালে;

২. ধোঁয়া, ধূপ ইত্যাদি নাক বা মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করালে;

৩. ধূমপান বা হুক্কা পান করলে;

৪. ছোলা পরিমাণ কোনো কিছু দাঁতের ফাঁক থেকে বের করে গিলে ফেললে;

৫. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে;

৬. কোনো অখাদ্যবস্তু গিলে ফেললে;

৭. ইচ্ছাকৃতভাবে ওষুধ সেবন করলে; খেলে বা পান করলে;

৮. রাত বাকি আছে ভেবে নির্দিষ্ট সময়ের পর সাহরি খেলে;

৯. ইফতারের সময় হয়ে গেছে মনে করে সূর্যাস্তের আগে ইফতার করলে;

১০. কুলি করার সময় হঠাৎ করে পেটের ভিতর পানি প্রবেশ করলে;

১১. বৃষ্টির পানি মুখে পড়ার পর পান করলে;

১২. ভুলক্রমে পানাহার করে সাওম নষ্ট হয়ে গেছে মনে করে আবার পানাহার করলে।

যাদের জন্য সাওম পালন বাধ্যতামূলক নয়

অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন নয়–এমন কারও জন্যই রোযা ফরয বা বাধ্যতামূলক নয়।

সাওম মাকরুহ হওয়ার কারণ

সাওম মাকরুহ হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। নিচে কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো–

১. গিবত বা পরনিন্দা করলে;

২. মিথ্যা কথা বললে, অশ্লীল আচরণ কিংবা গালমন্দ করলে;

৩. গলা শুকিয়ে যাওয়ার কারণে বারবার কুলি করলে;

৪. কুলি করার সময় গড়গড়া করলে। কারণ, এতে পানি গলার ভিতরে প্রবেশ করে রোযা ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে;

৫. সন্দেহের সময় পর্যন্ত বিলম্ব করে সাহরি খেলে;

৬. সময়মত ইফতার না করে বিলম্বে ইফতার করলে।

সাওমের কাযা

আরবিতে কাযা অর্থ কোনো কর্তব্য যথাসময়ের পরে পালন করা। কোনো অনিচ্ছাকৃত কারণে যদি সাওম ভেঙে যায় কিংবা অসুস্থতা বা কোনো শরিয়তসম্মত ওজরের কারণে সাওম পালন করা না হয়, এসব ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে একটি সাওমের পরিবর্তে একটি সাওমই পালন করতে হয়। একে কাযা সাওম বলে।

সাওম কাযা করার কারণসমূহ

১. সাওম পালনকারী রমযান মাসে অসুস্থ হলে, সফরে থাকলে, নারীদের ক্ষেত্রে 'মাসিক চক্র' শুরু হলে অথবা অন্য কোনো ওজরের কারণে সাওম পালনে অপারগ হলে।

২. রাত আছে মনে করে সুবহি সাদিকের পরে পানাহার করলে। অনুরূপভাবে সূর্যাস্ত হয়ে গেছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভরে বমি করলে।

৪. জোরপূর্বক রোযাদারকে কেউ কিছু খাওয়ালে।

৫. কুলি করার সময় কিংবা গোসলের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে পানি পেটে চলে গেলে।

৬. ভুলক্রমে কোনো কিছু খেয়ে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে পুনরায় খেলে।

৭. দাঁতের ভিতরে আটকে থাকা ছোলা বুট পরিমাণ কোনো বস্তু বের করে খেয়ে ফেললে।

কাফফারা

ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম পালন না করলে বা সাওম রেখে বিনা কারণে ভেঙে ফেললে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ফরজ হয়।

সাওমের কাফফারা

সাওমের জন্য কাফফারা হলো নিম্নরূপ:

১. একটি সাওম ভঙ্গ করলে একাধারে দুই মাস সাওম পালন করা। কাফফারার সাওম আদায়কালে যদি কোনো কারণে সাওম পালনে বিরতি দেওয়া হয় বা সাওম ভঙ্গ করা হয় তাহলে পূর্বের সাওম বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করে দুই মাস বিরতিহীনভাবে সাওম পালন করতে হবে।

২. একাধারে দুই মাস সাওম পালনে অক্ষম হলে ষাটজন মিসকিনকে পরিতৃপ্তির সাথে দুই বেলা খাওয়ানো। অথবা আহার না করিয়ে ষাটজন মিসকিনকে সদাকায়ে ফিতর সমপরিমাণ খাদ্যদ্রব্য দিয়ে দেওয়া যাবে। এমনিভাবে এর সমপরিমাণ মূল্য দিয়ে দেওয়াও জায়েয।

অথবা

৩. একজন দাসকে স্বাধীন করে দেওয়া।

মানবিক গুণাবলি বিকাশে সাওমের ভূমিকা

সিয়াম মানুষের মাঝে মানবতাবোধ বৃদ্ধি করে। রোযার প্রকৃত শিক্ষা গরিব ও দুঃখী মানুষের কষ্ট বুঝতে পারা। গরিব ও অসহায় মানুষ না খেয়ে থাকে ও অনেক কষ্ট করে থাকে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় মানুষের কেমন কষ্ট হয় তা অনুধাবন করতে পারে একজন রোযাদার ব্যক্তি। যার ফলে সে দানশীল হবে ও অভাবী মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। রোযার মাসে ধনী-দরিদ্র একত্র হয়ে তারাবিহর নামায আদায় করে। কোনো কোনো সময় একত্রে ইফতার করে যার মধ্যদিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। এক মানুষ অপর মানুষের প্রতি দয়া, মায়া, উদারতা, সেবা ও ভালোবাসার শিক্ষা পেয়ে থাকে। মানুষ রোযা রেখে কম কথা বলে। যার ফলে অশালীন কথা-বার্তা কম হয়ে থাকে। রোযার মাসে ঝগড়া-বিবাদ ও কলহ কম হয়ে থাকে। রোযা মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যার ফলে সামাজিক অপরাধ কম হয়। রোযার মাসে মানুষ ভালো কাজের চর্চা করে থাকে। এর ফলে সমাজে ভালো কাজের পরিধি বৃদ্ধি পায়। সহনশীলতা রোযার অন্যতম শিক্ষা। রোযার মাসে একে অপরের প্রতি সহনশীল আচরণ করে থাকে। সাওম যে কোনো কাজে সহনশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়।

দলগত কাজ:

১. শিক্ষার্থীরা সাওমের কাযা ও কাফফারার কারণ একটি পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।
২. শিক্ষার্থীরা সাওমের কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি নিয়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করবে।

ইতিকাফ

'ইতিকাফ' আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো আটকে থাকা, কোথাও অবস্থান করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় ইতিকাফ হচ্ছে জামাআতে সালাত অনুষ্ঠিত হয় এমন মসজিদে সাওম পালনরত অবস্থায় ইতিকাফের নিয়তে অবস্থান করা। যিনি ইতিকাফ পালন করেন তাকে 'মুতাকিফ' বলে। ইতিকাফের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে নির্দেশনা রয়েছে যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এবং ইবরাহিম ও ইসমাইলকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৫) মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন।

ইতিকাফের তাৎপর্য

ইতিকাফের লক্ষ্য হচ্ছে দুনিয়াদারির কোলাহলমুক্ত থেকে নিবিড়ভাবে ধ্যান অনুধ্যান করে মহান আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা। এছাড়া 'লাইলাতুল কদর' হলো হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বরকতময়। সুতরাং এই রাতের মর্যাদা হাসিলের লক্ষ্যে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইতিকাফ পালন করতেন। যেমন হাদিসে বর্ণিত আছে

'রাসুল (সা.) প্রতি রমযানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ পালন করতেন। এ আমলটি তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মহানবি (সা.)-এর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণও এই নিয়মে (ইতিকাফ) পালন করতেন।' (বুখারি)

ইতিকাফ পালনের নিয়মাবলি ও জরুরি মাসায়েল

১. ইতিকাফের নিয়তে রমযান মাসের ২০ তারিখ আসরের পরে সূর্যাস্তের আগে মসজিদে প্রবেশ করতে হয় এবং শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে ইতিকাফ শেষ করতে হয়।

২. শরিয়তসম্মত প্রয়োজন অথবা মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়। শরিয়তসম্মত প্রয়োজন বলতে প্রয়োজনে জুমার নামাযে শরিক হতে বের হওয়া আর মানবীয় প্রয়োজন বলতে পায়খানা বা প্রস্রাব করার জন্য বের হওয়া। উল্লেখ্য, জানাজা নামাযে শরিক হওয়ার জন্য মসজিদ হতে বের হওয়া যাবে না।

৩. প্রতি রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফ পালন করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া। যদি পাড়া বা মহল্লার যে কোনো একজন ইতিকাফ পালন করেন তবে সকলের পক্ষ থেকে ঐ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া আদায় হবে। কিন্তু কেউ পালন না করলে সকলে গুনাহগার হবে।

সাদাকাতুল ফিতর

ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সাওমের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে গরিব-দুঃখীদের সহযোগিতায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ-সম্পদ দান করা হয়, তাকে সাদাকাতুল ফিতর বলে। একে 'যাকাতুল ফিতর'ও বলা হয়।

মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ (সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য বা সমপরিমাণ অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকলে তাকে নিসাব বলে) সম্পদের মালিক প্রত্যেক স্বাধীন মুসলিম নর-নারীর ওপর 'সাদাকাতুল ফিতর' ওয়াজিব। শিশু ও নির্ভরশীল ব্যক্তির সাদাকা অভিভাবক আদায় করবে।

তাৎপর্য

মুসলমানগণ পবিত্র রমযান মাসে রোযা পালন করেন। পবিত্র রমযান মাসে রোযা পালনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার প্রতি যে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেন, তার শুকরিয়া হিসেবে এবং রোযা পালন কালে যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি হয়, তার ক্ষতিপূরণের জন্য 'সাদাকাতুল ফিতর' ওয়াজিব করা হয়েছে। সাদাকাতুল ফিতর পেলে গরিব-অনাথ লোকেরাও ঈদের খুশিতে অংশীদার হতে পারে। এভাবেই ধনী-গরিবের মধ্যে ব্যবধান কমে আসে এবং সম্প্রীতি ও সৌহার্দ গড়ে ওঠে। হাদিসে আছে,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ

অর্থ: 'রাসুলুল্লাহ (সা.) যাকাতুল ফিতর আবশ্যক করেছেন রোযাদারকে অর্নথক কথা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য ও মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থা করার নিমিত্তে। (আবু দাউদ)

আদায়ের নিয়ম

ঈদের সালাতের পূর্বে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। ঈদের আগেও 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করা যায়। তবে ঈদের দিন সালাতের উদ্দেশ্যে ঈদের মাঠে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায় করা উত্তম। ঈদের পর কেউ যদি তা আদায় করে তবে আদায় হবে কিন্তু সাওয়াব কম হবে।

গরিব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, ফকির-মিসকিনকে সাদাকাতুল ফিতর দেওয়া যাবে। একজনের ফিতরা একাধিক ব্যক্তিকে অথবা একাধিক ব্যক্তির ফিতরা একজনকে দেওয়া যাবে।

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ

মাথাপিছু নিসফু সা অর্থাৎ প্রায় পৌনে দুই কেজি গম (১ কেজি ৭৫০ গ্রাম গম) বা তার মূল্য আদায় করতে হবে। তবে গম ছাড়া যদি অন্যকোনো জিনিস যেমন– যব, কিসমিস, খেজুর, বা পনির দিয়ে আদায় করলে পূর্ণ এক সা' ৩ কেজি ৫০০ গ্রাম আদায় করতে হবে।

দলগত কাজ:

শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে 'সাদাকাতুল ফিতর' আদায়ের গুরুত্বের উপর আলোচনা করবে।

যাকাত

ইসলামি জীবন বিধানের মৌলিক যে পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে যাকাত তন্মধ্যে অন্যতম। ইমান, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ এ পাঁচটি বিধান মেনে চলা মুসলমানের জন্য ফরয বা অবশ্যকর্তব্য। এ পাঁচটি বুনিয়াদি বিধানের মধ্যে তিনটি বিধান ইমান, সালাত ও সাওম সকল মুসলমানের ওপর ফরয করা হয়েছে। আর বাকি দুটি বিধান যাকাত ও হজ্জ শুধুমাত্র সম্পদশালী ও সামর্থ্যবান মুসলমানদের ওপর ফরয করা হয়েছে। তাই যাকাত একটি আর্থিক ইবাদাত। প্রিয় শিক্ষার্থী, আজ আমরা ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ যাকাত সম্পর্কে জেনে নিই।

যাকাত পরিচিতি

যাকাত একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ হলো পবিত্রতা, বৃদ্ধি, আধিক্য, প্রাচুর্য ইত্যাদি। যাকাত প্রদান করলে যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির মনে কৃপণতার যে কলুষতা রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে মন পবিত্র হয়। তা ছাড়া বিত্তশালীদের সম্পদে দরিদ্রদের যে অধিকার রয়েছে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে তা করা হয়। ফলে এর মাধ্যমে তাঁর সম্পদও পবিত্র হয়। যাকাত প্রদান করলে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির সম্পদে বরকতদান করেন। এ ছাড়া যাকাত দরিদ্রদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। যাকাত প্রদানের ফলে দরিদ্রদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজের সামগ্রিক

অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়, তাই যাকাত প্রদানের মাধ্যম সম্পদও বৃদ্ধি পায়। এজন্য যাকাতের অন্য অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া।

ইসলামি পরিভাষায় যাকাত হচ্ছে শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত (নিসাব পরিমাণ) সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ বছর শেষে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মালিক বানিয়ে দেওয়া।

কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম সম্পদশালী ব্যক্তির নিকট যদি ৭.৫ তোলা স্বর্ণ কিংবা ৫২.৫ তোলা রৌপ্য অথবা এর সমপরিমাণ অর্থ কমপক্ষে এক বছর সঞ্চিত থাকে, তাহলে তাকে তার সম্পদের শতকরা ২.৫ হারে গরিব ও নিঃস্বদের হক আদায় করতে হয়। এ হক আদায় করার নামই যাকাত। এছাড়া শস্য, পশু, ব্যবসায়িক মাল ইত্যাদির ওপর সুনির্দিষ্ট হারে যাকাতের বিধান রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদের বিভিন্ন আয়াতে আমাদেরকে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে যাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

অর্থ: 'আর তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৩)

যাকাত ধনীদের সম্পদে আল্লাহর নির্ধারিত গরিবের অংশ যা প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য বা ফরয। এটি কোনো ধরনের দান বা অনুকম্পা নয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

অর্থ: 'তাদের (ধনীদের) ধন-সম্পদে অবশ্যই দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।' (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ১৯)

মহান আল্লাহর এ নির্দেশনার কারণেই দরিদ্রদের যাকাত প্রদান করা ধনীদের কোনো প্রকারের অনুগ্রহ, দয়া বা সহযোগিতা নয়। এটি তাদের সম্পদে অসহায়, গরিব, অভাবী ও নিঃস্বদের হক বা অধিকার। ধনী ব্যক্তিদের সম্পদ থেকে গরীব ও অসহায়দের এ হক আদায়ের নির্দেশ দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমরা তাদের জানিয়ে দাও যে, মহান আল্লাহ তাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তাদের মধ্যকার (নিসাব পরিমাণ) সম্পদশালীদের সম্পদ থেকে তা (যাকাত) আদায় করে নিঃস্বদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া হবে।।' (বুখারি)

যাকাতের তাৎপর্য

যাকাত একটি আর্থিক ফরয ইবাদাত। এর উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আর্থিক লেনদেন বা ব্যক্তি কিংবা সামষ্টিক পর্যায়ে সাহায্য-সহযোগিতা নয়। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনকে পরিশুদ্ধ করে তাকে শুদ্ধতম মানুষরূপে গড়ে তোলা এবং মহান আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করা।

প্রত্যেক স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম ব্যক্তি যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে, এমন ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করতে হয়। যাকাত প্রদানকারীর সম্পদে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করেন এবং এর বিনিময়ে আখিরাতে তাকে অফুরন্ত কল্যাণ প্রদান করবেন। হাদিসে কুদসিতে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে বনি আদম! আমার পথে খরচ করতে থাকো। আমি আমার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তোমাদের দিতে থাকব।' (বুখারি ও মুসলিম)

যাকাত প্রদানকারীর জন্য যেমন পুরস্কার রয়েছে তেমনি যাকাত প্রদানে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য শাস্তির দুঃসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, আল্লাহর বান্দাদের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরবর্তী। অপরদিকে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, আল্লাহর বান্দাদের থেকে দূরে এবং জাহান্নামের সন্নিকটে। আর একজন জাহিল দানশীল একজন কৃপণ আবেদ অপেক্ষা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়।' (তিরমিযী)

যারা যাকাত প্রদান করে না কুরআন মাজিদ ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যারা সোনা-রুপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে ভয়ানক শাস্তির সংবাদ দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, এগুলোই সে সমস্ত সোনা-রুপা, যা তোমরা জমা করতে। কাজেই তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ ভোগ করো।' (সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৪-৩৫)

সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণে ইসলাম যে সকল ব্যবস্থা মানুষকে উপহার দিয়েছে, তার অন্যতম হচ্ছে যাকাত। সম্পদের সুষম বণ্টন করা না গেলে সম্পদ কতিপয় মানুষের হাতে পঞ্জীভূত হয়ে পড়ে। ফলে সমাজে ব্যাপকভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। মানুষের অভাব-অনটন বেড়ে যায়, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। এসব সমস্যা থেকে মানবজাতিকে রক্ষার লক্ষ্যে মহান আল্লাহ প্রত্যেক সম্পদশালী ব্যক্তির উপর যাকাত অবশ্য পালনীয় বা ফরয করেছেন। তিনি চান এ সম্পদ সুষম বণ্টনের মাধ্যমে যেন মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়। এ জন্য যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তারা কৃপণ এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

অর্থ: 'আর মুশরিকদের জন্য শুধুই ধ্বংস, যারা যাকাত আদায় করে না।'(সূরা হা-মীম আস-সাজদা, আয়াত: ৬-৭)

যাকাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। যাকাত প্রদানের মাধ্যম সম্পদ ও মন পবিত্র হয়। তা ছাড়া এর মাধ্যমে সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে। যাকাত প্রদানকারীকে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে অফুরন্ত কল্যাণ দান করেন। পক্ষান্তরে যাকাত অস্বীকারকারীর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। তাই আমাদের কর্তব্য হলো, নিজে যাকাত প্রদান করা এবং অন্যকে যাকাত দানে উৎসাহিত করা।

যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

যাকাত মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় ইবাদাত। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমান নর-নারীর ওপর যাকাত ফরয। যাকাত হলো আর্থিক ইবাদাত। যাকাত দানের মাধ্যমে ব্যক্তির উপার্জিত সম্পদ পবিত্র হয়। ধন-সম্পদের মোহ ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। মানুষ তার জীবনের চেয়ে সম্পদকে বেশি ভালোবাসে। এ জন্য মানুষ সম্পদ আহরণের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে। অথচ আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য সেই সম্পদকে দান করে থাকে। তাই যাকাতদানকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ করবে। অপরপক্ষে যাকাত আদায় না করলে মহাপাপী হবে এবং জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। একজন মুসলিম স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করার মাধ্যমে তার ধন-সম্পদের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এর ফলে সে আত্মিক শান্তি পায়।
আল-কুরআনের ঘোষণা,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

অর্থ: 'তাদের সম্পদ হতে 'সাদাকা' (যাকাত) গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র এবং পরিশুদ্ধ করবে। তুমি তাদেরকে দোয়া করবে। তোমার দোয়া তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরা তাওবা, আয়াত: ১০৩)

যাকাতের সামাজিক গুরুত্ব

যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহৃদয়তা ও সহনশীলতার প্রকাশ ঘটে। অর্থনৈতিকভাবে যারা অসচ্ছল তারা আর্থিকভাবে সক্ষম হয়ে থাকে। ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমে থাকে। যাকাত দানের ফলে সমাজের গরিব, এতিম, বিধবা, বৃদ্ধ, রুগ্ণ, পঙ্গু, ও অক্ষম ব্যক্তিরা তাদের অভাব দূর করতে পারেন। অর্থের অভাবে মানুষ চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ছিনতাই ও সন্ত্রাসের মতো অসংখ্য খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। যাকাতের টাকা এ সকল মানুষকে অভাব থেকে দূরে রাখে এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ছাড়া যাকাতের মাধ্যমে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজ করা হয়ে থাকে। যার ফলে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

যাকাতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

সম্পদশালীদের সম্পদ যাকাত আকারে সমাজের দরিদ্র শ্রেণির হাতে আসে। যাকাতের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে সম্পদের প্রবাহ গতিশীল হয়। দরিদ্র শ্রেণি যাকাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করে থাকে। অভাবী মানুষ তার অভাব পূরণ করতে পারে। ক্ষুদ্র আয়ের মানুষ যাকাতের অর্থকে পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করে নিজের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে। প্রতিবছর যাকাত দেওয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্যের হার ক্রমান্বয়ে কমে আসবে।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

যাকাত ফরয ইবাদাত। তবে সকল মানুষের উপর যাকাত বাধ্যতামূলক নয়। যাকাত ফরয হওয়ার শর্তসমূহ নিম্নরূপ-

১. মুসলমান হওয়া;
২. নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া;
৩. নেসাব প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া;
৪. ঋণগ্রস্ত না হওয়া;
৫. নিসাব পরিমাণ সম্পদ মালিকের কাছে কমপক্ষে ১ বছর কাল থাকা।
৬. জ্ঞান-সম্পন্ন হওয়া; এবং
৭. বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হওয়া।
৮. স্বাধীন হওয়া

যাকাতের নিসাব

যাকাত ধার্য হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা। 'নিসাব' বলা হয় নির্ধারিত নিম্নতম সীমা বা পরিমাণকে। এই পরিমাণ নির্ধারণে ব্যক্তির সর্বমোট আয় থেকে যাবতীয় ব্যয় বাদ দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত অর্থ এবং তার পূর্বের সঞ্চয় ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ যুক্ত হবে। প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা এর সমমূল্যের সম্পদকে 'নিসাব' বলা হয়। এছাড়াও নগদ টাকার মোট পরিমাণ (হাতে ও ব্যাংকে মিলিয়ে) সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের দামের সমান হলে তাতেও ২.৫% হিসেবে যাকাত আদায় করতে হবে। এছাড়াও ফসলের যাকাত (উশর), ফল, তরিতরকারি, পশু সম্পদ ইত্যাদির ওপর যাকাতের বিধান আছে।

যাকাত বণ্টনের খাত

যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ পবিত্র কুরআনে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

অর্থ: 'সদকা তো (যাকাত) কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা তাওবা, আয়াত: ৬০)

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

উক্ত আয়াতে আল্লাহ যে আটটি খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. **ফকির বা দরিদ্র:** ফকির বলতে সেই ধরনের ব্যক্তিদেরকে বোঝায় যারা একেবারে নিঃস্ব নয়। তাদের কিছু সহায় সম্পদ আছে। তবে এত কম যে তা দিয়ে অতি কষ্টে জীবন নির্বাহ করে থাকে। তাদের মৌলিক প্রয়োজন যথা অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের খরচ নির্বাহ করার মতো সামর্থ্য নেই।

২. **মিসকিন বা নিঃস্ব:** যাদের জীবিকা নির্বাহের কোনো ব্যবস্থা বা নিশ্চয়তা নেই, জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা নেই। দৈহিকভাবে অক্ষম, বাঁচার জন্য অন্যের নিকট হাত পাততে হয়, তাদেরকে মিসকিন বা নিঃস্ব বলা হয়। এ ধরনের সকল প্রকার মিসকিন যাকাত পাবার যোগ্য।

৩. **যাকাত আদায়কারী কর্মচারী:** যে সকল কর্মচারী যাকাত বিভাগে কর্মরত। যারা যাকাত আদায় ও বণ্টনের সামগ্রিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত, তাদের বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্য যাকাতের অর্থ থেকে দেওয়া যাবে।

৪. **চিত্ত আকর্ষণের জন্য:** যারা নওমুসলিম, কিংবা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য। ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে সমাজচ্যুত ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল ইমান দ্বিধাগ্রস্ত তারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য। নওমুসলিম আর্থিকভাবে সক্ষম হলেও তাদের মনকে আকৃষ্ট করার জন্য যাকাত দেওয়া যেতে পারে।

৫. **দাসমুক্তি:** কোনো মুসলমান নর-নারী যদি দুর্ভাগ্যক্রমে দাসত্বের মধ্যে আটকা পড়ে বা বন্দি থাকে তবে তাকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের টাকা খরচ করা যেতে পারে।

৬. **ঋণমুক্তি:** ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যার পক্ষে বৈধ আয় দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয় তাদেরকে যাকাত দিয়ে ঋণমুক্ত করা যেতে পারে।

৭. **ফী সাবিলিল্লাহ:** 'ফী সাবিলিল্লাহ' বলতে আল্লাহর পথে খরচ করাকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর পথে যে সকল কাজ, সে সকল খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। দ্বীনি ইলম শিক্ষার্থী, আল্লাহর পথে জিহাদকারী কিংবা সৎ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যায়।

৮. **মুসাফির:** মুসাফির বলতে ওই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়ে থাকে যারা নিজ দেশে ধনী হলেও সফরে এসে নিঃস্ব ও দরিদ্র হয়ে গেছেন। অর্থাৎ পথে বা প্রবাসে সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে যাকাতের টাকা সাহায্য হিসেবে দেওয়া যায়।

এই অধ্যায় থেকে তুমি সালাত, সাওম এবং যাকাত সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছ। এই ইবাদাতগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কেও ধারণা লাভ করেছ। এই অধ্যায়ের প্রতিটি ইবাদাত ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা কি তুমি বুঝতে পেরেছ? এখন তাহলে এই ইবাদাতগুলোর শিক্ষাই তোমাকে কাজে লাগাতে হবে। তোমার আশেপাশের মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে। কিভাবে তা করবে সেটি শিক্ষক জানিয়ে দিবেন। সঠিকভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পারলে দেখবে তোমার নিজের কাছেই অনেক ভালো লাগছে। তাহলে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে ফেলো!

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী। এটি মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল, বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়াত ও রহমত। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা এটি মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর নাজিল করেছেন। আর নবি করিম (সা.) আমাদের নিকট এ পবিত্র বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহর তা'আলার আদেশ-নিষেধ নিজে আমল করে তিনি আমাদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি মানুষের নিকট এ বাণীর মর্ম ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে বলা হয় হাদিস। হাদিস আল কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। ইসলামি বিধি-বিধান পূর্ণরূপে পালন করার জন্য আল-কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক।

আল-কুরআন

ইসলামি শরিয়তের সকল বিধি-বিধানের মূল উৎস হলো আল-কুরআন। এটি শরিয়তের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস। এর উপরই ইসলামি শরিয়তের মূলভিত্তি ও কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের মৌলিক নীতিমালা আল-কুরআনে বিদ্যমান। এসব মৌলিক নীতিমালার আলোকেই ইসলামের সকল বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ: 'আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ।' (সূরা আন নাহল, আয়াত: ৮৯)

আল কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী। এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর এ কিতাব নাযিল করেন। এ কিতাব আরবি ভাষায় নাজিলকৃত। ইসলামি শরিয়তের প্রধান উৎস হিসেবে আল-কুরআনে মানবজাতির জীবন পরিচালনার সুস্পষ্ট মূলনীতি ও নির্দেশনা বিদ্যমান।

কুরআন মাজিদ সহজ ও সাবলীল ভাষায় নাযিলকৃত। এতে কোনোরূপ অস্পষ্টতা, বক্রতা কিংবা জটিলতা নেই। বরং এতে খুবই সুন্দর ও সরল ভাষায় নানা বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। অতি সাধারণ মানুষও এ কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

আল-কুরআনের পরিচয়

'কুরআন' (اَلْقُرْاٰن) শব্দটি আরবি। এর অর্থ হলো বহুল পঠিত। আল-কুরআন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পঠিত কিতাব। প্রত্যেক দিন কোটি-কোটি মুসলমান এ গ্রন্থ তিলাওয়াত করে থাকে। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এ গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন সূরা ও আয়াত পাঠ করে থাকি। এ জন্য এ কিতাবের নাম রাখা হয়েছে 'আল-কুরআন'। ইসলামি পরিভাষায়, আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন তাকেই আল-কুরআন বলা হয়।

আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী। এটি মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলিল, বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়াত ও রহমত। আল্লাহ তা'আলা মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে এটি নাজিল করেন। আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সর্বশেষ নাজিল করা হয়েছে। এরপর আর কোনো কিতাব আসেনি। আর ভবিষ্যতেও আসবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবের বিধি-বিধান ও শিক্ষা বলবৎ থাকবে। এটি সর্বকালের সকল মানুষের জন্য হিদায়াতের উৎসস্বরূপ। আল-কুরআনের নির্দেশনা মেনে চললে মানুষ দুনিয়াতে শান্তি ও সম্মান পাবে। আর আখিরাতে চিরশান্তির জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۙ

অর্থ: 'এই কিতাব আমি নাযিল করেছি, যা কল্যাণময়। অতএব, তোমরা এর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।' (সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১৫৫)

আল-কুরআন অবতরণ

আল-কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। আল্লাহ তা'আলা ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে রমযান মাসের ২৭ তারিখ লাইলাতুল ক্বদর বা মহিমান্বিত রাতে কুরআন মাজিদ নাযিল করা শুরু করেন। আমরা এ রাতকে শবে কদরও বলে থাকি। এটি লাওহে মাহফুজ বা সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ আছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

بَلۡ هُوَ قُرۡاٰنٌ مَّجِيۡدٌ ۙ فِيۡ لَوۡحٍ مَّحۡفُوۡظٍ ۟

অর্থ: 'বস্তুত এটি সম্মানিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।'(সূরা আল বুরুজ, আয়াত: ২১-২২)

আল-কুরআন আল্লাহর বাণী যা তিনি আরবি ভাষায় নাযিল করেছেন। কারণ, আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ভাষা ছিল আরবি। তিনি আরব দেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সময় গোটা আরব ছিল অজ্ঞতা ও বর্বরতায় আচ্ছন্ন। তারা মূর্তির পূজা করত। নবি করিম (সা.) আরবদের এরূপ অজ্ঞতা ও বর্বরতা পছন্দ করতেন না। তিনি সব সময় সত্য ও সুন্দরের অনুসন্ধান করতেন। এ জন্য তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই তাঁর নিকট সর্বপ্রথম কুরআনের বাণী নাজিল হয়। তিনি সত্যের সন্ধান পান। তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শেষ নবি ও রাসুল হিসেবে মনোনীত করেন এ সময় মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আ.) সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করেন। এটাই ছিল সর্বপ্রথম ওহি। তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজন অনুসারে আল কুরআনের বিভিন্ন অংশ অল্প অল্প করে নাযিল করেন। কখনও ৫ আয়াত, কখনও ১০ আয়াত, কখনও আয়াতের অংশবিশেষ, আবার কখনও একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা একসাথে নাযিল হতো। এভাবে দীর্ঘ ২৩ বছরে আল কুরআন সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হয়।

আল-কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব

আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আল-কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ ۝

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্যই আমিই এর সংরক্ষক।' (সূরা আল হিজর, আয়াত: ৯)

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আল-কুরআনের সংরক্ষক। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ কিতাব সংরক্ষণ করেন। এ জন্য আজ পর্যন্ত এ কিতাবের একটি হরফ (অক্ষর), হরকত বা নুকতারও পরিবর্তন হয়নি। এটি যেভাবে নাজিল হয়েছিল আজও ঠিক সেভাবেই বিদ্যমান। আর কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। পবিত্র কুরআন সেই প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত অগণিত হাফেযের মাধ্যমেও সংরক্ষিত আছে। কেউ ভুল করলে সাথে সাথে অন্যরা-এমনকি সালাত অবস্থায়ও সংশোধন করে দেন।

আল-কুরআন সংরক্ষণ

কুরআন মাজিদের কোনো অংশ নাযিল হলে সর্বপ্রথম মহানবি (সা.) তা নিজে মুখস্থ করে নিতেন। এরপর তা সাহাবিগণকে মুখস্থ করতে বলতেন। মহানবি (সা.)-এর উৎসাহ ও নির্দেশে সাহাবিগণ আল-কুরআন মুখস্থ করতেন, দিনরাত তিলাওয়াত করতেন, নামাযে পাঠ করতেন এবং পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান ও বন্ধু-বান্ধবদের মুখস্থ করাতেন। এভাবে আল-কুরআন সর্বপ্রথম মুখস্থ করার মাধমে সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য, তৎকালীন আরবদের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তাঁরা কোনো জিনিস শিখলে তা আর কখনও ভুলতেন না। সম্ভবত আল-কুরআন মুখস্থ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এরূপ অসাধারণ স্মরণশক্তি দান করেছিলেন। তাঁদের এ অসাধারণ স্মরণশক্তির কারণে কুরআন মাজিদ সহজেই তাঁদের স্মৃতিপটে সংরক্ষিত হয়।

আল-কুরআন লেখনীর মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা হয়। কুরআনের কোনো অংশ নাযিল হলে তা মুখস্থ করার পাশাপাশি লিখে রাখার জন্যও নবি করিম (সা.) নির্দেশ দিতেন। যে সকল সাহাবি লিখতে জানতেন তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁদের বলা হয় কাতিবে ওহি বা ওহি লেখক। তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪২ জন। প্রধান ওহি লেখক সাহাবি ছিলেন হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা.)। ওহি লেখক সাহাবিগণের মধ্যে কেউ না কেউ সদা সর্বদা নবি (সা.)-এর সাথে থাকতেন। কুরআনের কোনো অংশ নাযিল হলে তাঁরা সাথে সাথেই তা লিখে রাখতেন। সেসময় কুরআন মাজিদ খেজুর গাছের ডাল, পশুর হাড়, চামড়া, ছোট ছোট পাথর ইত্যাদিতে লিখে রাখা হতো।

আল-কুরআন সংকলন

মহানবি (সা.) এর সময়ে আল-কুরআন মুখস্থ ও লেখনীর মাধ্যমে পুরোপুরি সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু সে সময় তা একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ হয়নি। বরং তাঁর তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ টুকরোগুলো নানাজনের নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-ই সর্বপ্রথম কুরআন সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তাঁর সময় ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের বহুসংখ্যক হাফিজ শাহাদাৎবরণ করেন। এ অবস্থা দেখে হযরত উমর (রা.) ভাবলেন কুরআনের হাফিজগণ এভাবে ইন্তেকাল করলে কুরআনের অনেক অংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কে কুরআন সংকলনের পরামর্শ দেন। হযরত উমর (রা.) এর পরামর্শক্রমে হযরত আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। তিনি প্রধান ওহি লেখক সাহাবি হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.) এর মাধ্যমে সাহাবিদের নিকট সংরক্ষিত কুরআনের লিখিত অংশগুলো একত্র করেন। পাশাপাশি তিনি কুরআনের হাফিজগণের সাহায্যও গ্রহণ করেন। কুরআনের প্রতিটি অংশ তিনি লেখনী ও মুখস্থ উভয় পদ্ধতির সাথে মিলিয়ে দেখেন। এভাবে তিনি সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে আল কুরআনের প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। আল

কুরআনের এ কপিটি খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর তা দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত থাকে। হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর এ কপিটি তাঁর মেয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত থাকে।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তাঁর সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্য ছিল বিশাল-বিস্তৃত। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ও দেশে ইসলামের মর্মবাণী ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। এ সময় বিভিন্ন অঞ্চলে কুরআনের পাঠরীতি নিয়ে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানা অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় হযরত উসমান (রা.) বিশিষ্ট সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করে আল কুরআনের একক ও প্রামাণ্য পাঠরীতি প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি হযরত যায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি হযরত হাফসা (রা.)-এর নিকট সংরক্ষিত মূল পাণ্ডুলিপি থেকে আরও সাতটি অনুলিপি প্রস্তুত করেন। এরপর বিভিন্ন প্রদেশে আল কুরআনের একটি করে কপি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে পবিত্র কুরআনের পাঠরীতি নিয়ে মুসলমানদের অনৈক্য দূর হয়। আল কুরআন সংরক্ষণের এরূপ অসামান্য অবদানের জন্য হযরত উসমান (রা.) কে 'জামিউল কুরআন' বলা হয়। জামিউল কুরআন অর্থ কুরআন সংকলক বা কুরআন একত্রকারী।

তাজবিদ

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত অনেক। এটি নফল ইবাদাতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদাত। কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

অর্থ: 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফও পাঠ করবে, সে একটি নেকি লাভ করবে। আর এ নেকির পরিমাণ হলো দশগুণ।' (তিরমিযি)

পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ বা বর্ণ তিলাওয়াতের দশটি করে সাওয়াব লেখা হয়। যেমন:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম) -এর মধ্যে ১৯টি বর্ণ রয়েছে। কেউ যদি এটি তিলাওয়াত করে তবে সে (১৯×১০) = ১৯০টি নেকি লাভ করবে।

কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে তাজবিদ অনুসারে। আল কুরআনকে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুযায়ী শুদ্ধ ও সুন্দররূপে পাঠ করাকে তাজবিদ বলে। তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া ওয়াজিব বা আবশ্যক। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ

অর্থ: ‘কুরআন তিলাওয়াত করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।’ (সূরা আল-মুযাম্মিল, আয়াত: ৪)

তাজবিদ অনুসারে কুরআন না পড়লে গুনাহ হয়। এতে অনেক সময় কুরআনের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। আর অশুদ্ধ তিলাওয়াতের ফলে সালাতও পূর্ণাঙ্গ হয় না। তাই আমাদেরকে অবশ্যই তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে।

তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন তিলাওয়াতের বেশ কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। যেমন: মাখরাজ, সিফাত, মাদ্দ, ওয়াকফ, গুন্নাহ ইত্যাদি। পূর্ববর্তী শ্রেণিসমূহে আমরা তাজবিদের বেশকিছু নিয়ম সম্পর্কে জেনেছি। এ শ্রেণিতে আমরা মাদ্দ ও ওয়াকফ সম্পর্কে জানব।

মাদ্দ

মাদ্দ শব্দের অর্থ দীর্ঘ করা, লম্বা করা। তাজবিদের পরিভাষায় মাদ্দের হরফের ডান দিকের হরকতযুক্ত হরফ লম্বা করে পড়াকে মাদ্দ বলা হয়। মাদ্দ বিশিষ্ট হরফটি উচ্চারণকালে শ্বাস এবং আওয়াজকে দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

মাদ্দের হরফ মোট তিনটি। যথা: আলিফ, ওয়াও, ইয়া (ى – و –ا)।

এ তিনটি হরফ নিম্নলিখিত অবস্থায় মাদ্দের হরফ হিসেবে উচ্চারিত হয়:

(ক) ا (আলিফ)-এর পূর্বের হরফে যবর (ـَـ) থাকলে। যেমন: بَا

(খ) و (ওয়াও)-এর উপর জযম (ـْـ) এবং তার ডান পাশের হরফে পেশ (ـُـ) থাকলে। যেমন: بُوْ

(গ) ى (ইয়া)-এর উপর জযম (ـْـ) এবং এর ডান পাশের হরফে যের (ـِـ) থাকলে। যেমন: بِىْ

উপর্যুক্ত তিনটি অবস্থায় ى - و -ا মাদ্দের হরফ হিসেবে গণ্য হয়। ফলে এর পূর্বের অক্ষর একটু দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

প্রকারভেদ

মাদ্দ প্রধানত দুই প্রকার। যথা:

১. মাদ্দে আসলি (মূল মাদ্দ)

২. মাদ্দে ফারঈ (শাখা মাদ্দ)

নিম্নে এ দুটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো:

১. মাদ্দে আসলি (মূল মাদ্দ)

ওয়াও সাকিনের পূর্বের হরফে পেশ, আলিফের পূর্বের হরফে যবর এবং ইয়া সাকিনের পূর্বের হরফে যের থাকলে তাকে মাদ্দে আসলি বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, মাদ্দের হরফের পূর্বে বা পরে জযম (ـْـ) বা হামযা (ء) কিংবা তাশদিদ (ـّـ) না থাকলে তাকে মাদ্দে আসলি বলে। মাদ্দে আসলিকে মাদ্দে তাবয়িও বলা হয়। এরূপ মাদ্দে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

উল্লেখ্য, একটি সোজা আঙুলকে স্বাভাবিকভাবে বাঁকা করে হাতের তালুতে লাগাতে যে সময়ের প্রয়োজন, তাকে এক আলিফ পরিমাণ সময় বলে। এভাবে দুই, তিন ও চার আলিফ পরিমাণ সময় নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণ:
نُوْحِيْهَا

এ শব্দটিতে একসাথে মাদ্দে আসলির তিন ধরনের উদাহরণ রয়েছে। যেমন,

(ক) نُوْ এখানে و (ওয়াও) -এর উপর জযম (ـْـ) এবং তার পূর্বের হরফ ن (নুন)-এর উপর পেশ (ـُـ) রয়েছে।

(খ) حِيْ এখানে ى (ইয়া)-এর উপর জযম (ـْـ) এবং তার পূর্বের হরফ ح (হা)-এর নিচে যের (ـِـ) রয়েছে।

(গ) هَا এখানে ا (আলিফ) -এর পূর্বের হরফ ه (হা)-এর উপর যবর (ـَـ) রয়েছে।

এ তিনটি ক্ষেত্রেই মাদ্দের হরফ ى – و – ا এর পূর্বে বা পরে জযম (ـْـ) বা, হামযা (ء) বা তাশদিদ (ـّـ) নেই। সুতরাং এগুলো মাদ্দে আসলি। এরূপ অবস্থায় ح – ه ن (নুন, হা, হা) অক্ষরকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

কুরআন মাজিদের যে সকল হরফের উপর খাড়া যবর (ـٰـ),নিচে খাড়া যের (ـٖـ) এবং উপরে উল্টা পেশ (ـٗـ) রয়েছে, সে সকল হরফকে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যেমন:

اِلٰهِ النَّاسِ

لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ

مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ

এখানে ل (লাম) হরফের উপর খাড়া যবর (ـٰـ), ه (হা) হরফের নিচে খাড়া যের (ـٖـ) এবং ه (হা) হরফের উপর উল্টো পেশ (ـٗـ) রয়েছে। সুতরাং, ه – ه ل -(লাম, হা, হা) হরফগুলোকে এক আলিফ দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

২. মাদ্দে ফারঈ (শাখা মাদ্দ)

ফারঈ অর্থ শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। মাদ্দে আসলি থেকে যে সকল মাদ্দ বের হয় তাকে মাদ্দে ফারঈ বলে। অর্থাৎ মাদ্দের হরফের পরে জযম (ـْ) বা হামযা (ء) বা তাশদিদ (ـّ) থাকলে সেসব স্থানে দীর্ঘ করে পড়তে হয়। একে মাদ্দে ফারঈ বলে।

উদাহরণ

(ক) اٰلْاٰنَ – এ শব্দে মাদ্দের হরফ এর পর লাম হরফে জযম (ـْ) হয়েছে। এটি মাদ্দে ফারঈ। অতএব, আমরা এ স্থানে হামযাকে লম্বা করে পড়ব।

(খ) وَمَا اَدْرٰىكَ — جَاۤءَ - এ উদাহরণ দুটিতে মাদ্দের হরফ আলিফ-এর পর হামযা এসেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে জিম (ج) ও মীম (م) হরফকে মাদ্দে ফারঈ হিসেবে দীর্ঘ করে পড়তে হবে।

(গ) وَلَا الضَّاۤلِّيْنَ – كَاۤفَّةً আলোচ্য উদাহরণদ্বয়ে মাদ্দের হরফ আলিফ এর পর লাম (ل) এবং ফা (ف) হরফে তাশদিদ (ـّ) হয়েছে। এটি মাদ্দে ফারঈ- এর অন্যতম রূপ। এরূপ ক্ষেত্রেও হরফকে লম্বা করে পড়তে হবে।

উল্লেখ্য, আল-কুরআনের অনেক স্থানে হরফের উপর এসব মাদ্দের চিহ্ন দেওয়া থাকে। যেমন: ~, ⁀ হরফের উপর এরূপ চিহ্ন থাকলে সে হরফকে লম্বা করে পড়তে হয়। হরফের উপর (⁀) চিহ্ন থাকলে চার আলিফ এবং (~) চিহ্ন থাকলে তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হবে। যেমন: اُوْلٰۤىِٕكَ — مَاۤ اَغْنٰى

জোড়ায় কাজ: কুরআন তিলাওয়াতে তাজবিদের গুরুত্ব সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো।

দলগত কাজ: মাদ্দের প্রকারভেদের একটি তালিকা তৈরি করো।

বাড়ির কাজ: মাদ্দের নাম ও কোন মাদ্দ কয় আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয় তা লেখো।

ওয়াকফ

ওয়াকফ আরবি শব্দ। এর অর্থ থেমে যাওয়া, বিরতি দেওয়া, স্থগিত রাখা ইত্যাদি। তাজবিদের পরিভাষায় কুরআন তিলাওয়াতের সময় কোনো আয়াত বা শব্দের শেষে প্রয়োজন অনুসারে থেমে যাওয়া বা বিরতি দেওয়াকে ওয়াকফ বলে। অন্য কথায়, দুই নিঃশ্বাসের মধ্যবর্তী বিরতির সময়কে ওয়াকফ বলা হয়। ওয়াকফ যে হরফের উপর করা হয় সে হরফে সাকিন না থাকলে সাকিন করে ওয়াকফ করতে হয়।

কুরআন তিলাওয়াতের মাঝে এরূপ ওয়াকফ করা খুবই জরুরি। কেননা কোনো কোনো সময় ওয়াকফ না করে মিলিয়ে পড়লে আয়াতের অর্থই পরিবর্তন হয়ে যায়।। তা ছাড়া আমরা বেশি সময় নিঃশ্বাস ধরে রাখতে পারি না। কিছুক্ষণ পরপর আমাদের শ্বাস নিতে হয়। তিলাওয়াতের সময়ও এক শ্বাসে পুরো তিলাওয়াত করা সম্ভব নয়। এ জন্য আয়াতের মধ্যে থামতে হয়। আয়াতের মধ্যে এরূপ বিরতি নেওয়াকেই ওয়াকফ বলে।

আল-কুরআনকে সুন্দর ও শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করতে হবে। সেজন্য তিলাওয়াতকালে যেখানে ইচ্ছা সেখানে থামা যাবে না। তাতে কুরআন তিলাওয়াতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। নির্ধারিত স্থানে ওয়াকফ করতে হবে। তবে কেউ অপারগ হলে বা শ্বাস রাখতে না পারলে নির্ধারিত স্থানের পূর্বেই ওয়াকফ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে তিলাওয়াত করার সময় পুনরায় যে শব্দে ওয়াকফ করেছে, সে শব্দ থেকে তিলাওয়াত করতে হবে।

আমাদের প্রিয়নবি (সা.) সূরা ফাতিহার প্রত্যেক আয়াতের পর ওয়াকফ করতেন। অন্যান্য সুরা তিলাওয়াতের সময় থেমে থেমে ধীরস্থিরভাবে সুন্দর করে তিলাওয়াত করতেন। আমাদেরও ঠিক সেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত।

আল-কুরআনে ওয়াকফের নানারকম চিহ্ন দেওয়া আছে। এগুলো হলো বিরাম চিহ্ন। এগুলো সম্পর্কে জানা থাকলে শুদ্ধভাবে ওয়াকফ করা যায়। নিম্নে এ চিহ্নসমূহের পরিচয় দেওয়া হলো:

○ - এ চিহ্নকে বলা হয় 'ওয়াকফ তাম'। এটি বাক্য বা আয়াতের চিহ্ন। অর্থাৎ এ চিহ্ন দ্বারা আয়াত শেষ হওয়া বোঝা যায়। এ চিহ্নে থামতে হবে।

م – একে 'ওয়াকফ লাযিম' বলে। এ চিহ্নে ওয়াকফ করা অত্যাবশ্যক। এতে ওয়াকফ না করলে আয়াতের অর্থ বিকৃত হয়ে যেতে পারে।

ط– এটি 'ওয়াকফ মুতলাক'- এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নে ওয়াকফ করা উত্তম।

ج – এটি 'ওয়াকফ জায়িজ'-এর চিহ্ন। এরূপ চিহ্নিত স্থানে থামা কিংবা না থামা উভয়ই জায়েয। তবে এতে ওয়াকফ করা ভালো।

ز – একে 'ওয়াকফ মুজাওওয়াজ' বলে। এ চিহ্নে না থামা ভালো।

ص – এ চিহ্নকে বলা হয় 'ওয়াকফ মুরাখখাস'। এখানে না থামা ভালো। তবে অপারগ হলে এ স্থানে থামা যাবে।

ق – এ চিহ্নে থামা ও না থামা প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। তবে এতে না থামা ভালো।

قف – এটি ওয়াকফ আমর। অর্থাৎ এতে থামার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে থামা উচিত।

لا – এটি না থামার নির্দেশ। এরূপ স্থানে না থেমে মিলিয়ে পড়তে হবে।

صل – এ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দেওয়া বা না দেওয়া উভয়ই জায়েয। তবে বিরতি দেওয়াই উত্তম।

صلى – এ স্থানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

س / سكته – এ চিহ্নের নাম সাকতাহ। এরূপ চিহ্নিত স্থানে শ্বাস ছাড়া যাবে না। অর্থাৎ পড়া বন্ধ থাকবে তবে শ্বাস জারি থাকবে।

∴/ مع/معانقة – এ চিহ্নের নাম মুআনাকা। আয়াতের বা শব্দের ডানে এবং বামে (তিন বিন্দু) অথবা مع চিহ্ন থাকে। এ অবস্থায় তিলাওয়াতকালে এক স্থানে থামতে হয় এবং অপর স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়।

وقف النبى – ওয়াকফুন নাবি (সা.)। এরূপ চিহ্নিত স্থানে মহানবি (সা.) ওয়াকফ করেছিলেন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

وقف جبرائيل– ওয়াকফ জিবরাইল (আ.)। এরূপ চিহ্নিত স্থানে বিরতি দিলে বরকত লাভ হয়।

وقف غفران– ওয়াকফ গুফরান। এ স্থানে থামলে গুনাহ মাফ হওয়ার আশা করা যায়।

وقف منزل - ওয়াকফ মানযিল। এরূপ চিহ্নিত স্থানে মিলিয়ে পড়ার চেয়ে বিরতি দেওয়া ভালো।

নাযিরা তিলাওয়াত

কুরআন মাজিদ আল্লাহর বাণী। কুরআন মাজিদ দেখে দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলে। দেখে দেখে কুরআন তিলাওয়াত একটি উত্তম ইবাদাত। কুরআনের প্রতিটি হরফ তিলাওয়াতের জন্য মহান আল্লাহ তিলাওয়াতকারীকে অন্তত দশটি নেকি দান করেন। যে ঘরে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা হয় সে ঘরে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তির মর্যাদা অনেক। এমনকি যে কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে যায় এবং তিলাওয়াত তার জন্য কষ্টসাধ্য হয় তাকেও আল্লাহ তা'আলা রকুরআন পাঠে দ্বিগুণ সাওয়াব দেবেন বলে মহানবি (সা.) উল্লেখ করেছেন। আর যে অন্তরে কুরআন মাজিদের একটি আয়াতও নেই মহানবি (সা.) সে অন্তরকে একটি শূন্য ঘরের সাথে তুলনা করেছেন। কাজেই আমরা শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত শিখব এবং প্রত্যহ তিলাওয়াত করব।

কুরআন তিলাওয়াতের আদব

কুরআন মাজিদের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা অতুলনীয়। সৃষ্টিজগতের সকল কিছুর ইহকালীন ও পরকালীন মঙ্গল এ কিতাবে বর্ণিত বিধি-নিষেধ মেনে চলার মধ্যে নিহিত। এ পবিত্র কালাম তিলাওয়াতের সময় এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। সুতরাং অত্যন্ত আদবের সাথে এ কিতাব তিলাওয়াত করা উচিত। বাহ্যিক আদব রক্ষার সাথে সাথে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। তিলাওয়াতের সময় নিজের মনকে যাবতীয় কলুষ থেকে মুক্ত করে আল্লাহর অভিমুখি করে তিলাওয়াত শুরু করা উচিত। তাই কুরআন তিলাওয়াতের কতিপয় আদব নিচে দেওয়া হলো:

(১) সুন্দরভাবে ওযু করে পবিত্র স্থানে কিবলামুখি হয়ে বসা।

(২) পবিত্র কুরআনকে কোনো কিছুর ওপরে রেখে তিলাওয়াত করা।

(৩) তিলাওয়াতের পূর্বে কয়েকবার দরুদ শরিফ পাঠ করা।

(৪) আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে তিলাওয়াত শুরু করা।

(৫) ধীরে ধীরে তাজবিদের সাথে মিষ্টি-মধুর স্বরে তিলাওয়াত করা।

(৬) তিলাওয়াতের সময় হাসি-তামাশা বা কোনো রূপ কথা বার্তা না বলা।

(৭) একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করা।

(৮) তিলাওয়াত শেষে কুরআনকে খুব সম্মানের সাথে কোনো উচুঁ স্থানে রেখে দেওয়া।

অর্থ ও পটভূমিসহ কুরআন মাজিদের কয়েকটি সূরা

সূরা আল-লাহাব (سُوْرَةُ اللَّهَبِ)

সূরা আল-লাহাব আল-কুরআনের ১১১তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা ৫টি। এ সূরায় কাফির আবু লাহাবের চরিত্র ও পরিণতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা লাহাব। আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল ওজ্জা। সে ছিল আবদুল মোত্তালিবের অন্যতম সন্তান, রাসুল (সা.)-এর আপন চাচা। শরীরের উজ্জ্বল টকটকে রঙের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবু লাহাব। সে ছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কট্টর শত্রু ও ইসলামের ঘোরবিরোধী। রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সে সব সময় কষ্ট দিত। রাসুল (সা.) যখন মানুষকে ইমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে পিছে পিছে গিয়ে আল্লাহর রাসুলকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত, মাঝে মাঝে তাঁকে পাথরও ছুঁড়ে মারত।

শানে নুযূল

সূরা আল-লাহাব মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। রাসুল (সা.)-এর প্রতি আল্লাহর বাণী,

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

অর্থ : 'আর আপনি আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।' (সূরা আশ-শু'আরা: ২১৪)

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলে মহানবি (সা.) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কুরাইশ গোত্রের উদ্দেশ্যে (وَا صَبَاحَاه) হায়! সকাল বেলার বিপদ বলে অথবা আবদে মানাফ ও আবদুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। এভাবে ডাক দেওয়া তখন আরবে বিপদাশঙ্কার লক্ষণরূপে বিবেচিত হতো। ডাক শুনে কুরাইশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হলো। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের বললেন: যদি আমি বলি যে, 'একটি শত্রুদল ক্রমশই এগিয়ে আসছে এবং সকাল-বিকাল যে কোনো সময় তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে', তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? সবাই এক বাক্যে বলে উঠল: হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন: আমি শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভীষণ এক আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সর্তক করছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল,

تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا

অর্থ : 'ধ্বংস হও তুমি! এ জন্যই কি আমাদেরকে একত্রিত করছে?' অতঃপর সে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে পাথর মারতে উদ্যত হলো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।' (বুখারি ও মুসলিম)

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
تَبَّتْ	ধ্বংস হোক, বিনষ্ট হোক	ذَاتَ لَهَبٍ	লেলিহান, শিখাযুক্ত
يَدَا	দুই হাত	اِمْرَأَتُهٗ	তার স্ত্রী
يَدٌ	হাত	حَمَّالَةَ	বহনকারিণী
مَا أَغْنٰى	কোনো কাজে আসেনি, কোনো উপকার করেনি, রক্ষা করেনি	اَلْحَطَبِ	কাঠ, লাকড়ি, ইন্ধন
كَسَبَ	সে উপার্জন করেছে	جِيْدِ	গলা
سَيَصْلٰى	সে অচিরেই প্রবেশ করবে	حَبْلٌ	রশি, ফাঁস, রজ্জু
نَارًا	আগুন, দোযখ	مَسَدٍ	পাকানো, প্যাঁচানো

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
تَبَّتْ يَدَآ اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ؕ ۝	১. আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।
مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ؕ ۝	২. তার ধন-সম্পদও যা সে উপার্জন করেছে, তা কোনো কাজে আসেনি।
سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝	৩. শীঘ্রই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে।
وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝	৪. এবং তার স্ত্রীও (প্রবেশ করবে) যে ইন্ধন বহন করে।
فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝	৫. তার গলায় পাকানো রশি।

ব্যাখ্যা

আবু লাহাব ছিল ইসলামের চরম শত্রু। সে সর্বদাই ইসলামের শত্রুতায় লিপ্ত ছিল। এ সূরায় তার শোচনীয় পরিণতির কথা বলা হয়েছে। মক্কা নগরীতে সে প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। সে প্রচুর ধনসম্পদেরও মালিক ছিল। কিন্তু এত কিছুও তার কোনো কাজে আসেনি। বরং দুনিয়াতেও আবু লাহাবের ধ্বংস, আর আখিরাতেও সে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তার স্ত্রী উম্মে জামিলও ছিল তারই মতো ইসলামের শত্রু। সে-ও রাসুল (সা.)-কে কষ্ট দিত। সে রাসুল (সা.)-এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। ফলে তার প্রতিও আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ রয়েছে এবং সে আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

উল্লেখ্য, এই সূরা নাজিল হওয়ার কয়েক বছর পর আবু লাহাবের পচন ধরা সংক্রামক প্লেগ রোগ দেখা দেয়। তখন সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে নির্জন জায়গায় রেখে আসে। শেষ পর্যন্ত এই অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিন দিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি। পচন শুরু হলে চাকর-বাকরদের দ্বারা সেখানে মাটি খুঁড়ে কাঠ দিয়ে দূর থেকে ঐ গর্তে ফেলে দেয় এবং দূর থেকে পাথর নিক্ষেপ করে দাফন করা হয়। (বয়ানুল কুরআন)

শিক্ষা

১. শান্তির দূত রাসুলুল্লাহ (সা.) ও ইসলামের বিরোধিতা করা খুবই মারাত্মক অপরাধ।

২. রাসুলুল্লাহ (সা.) ও মানবতার ধর্ম ইসলামের বিরোধিতা করলে আল্লাহ তা'আলা ভীষণ অসন্তুষ্ট হন।

৩. আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর মতো কাজ যারা করবে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস অনিবার্য।

৪. দুনিয়ার মানসম্মান, ধনসম্পদ ইসলামের এসব শত্রুকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

দলগত কাজ:
শিক্ষার্থীরা সূরা লাহাবের শিক্ষাগুলো লিখে একটি রঙিন পোস্টার তৈরি করবে।

সূরা আন-নাসর (سُوْرَةُ النَّصْرِ)

সূরা আন-নাসর পবিত্র কুরআনের ১১০তম সূরা। এ সূরার 'নাসর' শব্দ থেকে সূরাটির নাম রাখা হয়েছে আন-নাসর। এর আয়াত সংখ্যা তিন। এই সূরা মক্কায় বিদায় হজ্জের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু সংজ্ঞা অনুযায়ী, যে সমস্ত সূরা হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো হলো মাদানি সূরা। এ হিসেবে এটিও মাদানি সূরা।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اِذَا	যখন	دِيۡنِ اللّٰهِ	আল্লাহর দ্বীন
جَآءَ	আসবে	أَفۡوَاجًا	দলে দলে
نَصۡرُ اللّٰهِ	আল্লাহর সাহায্য	فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ	অতঃপর আপনি প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন
وَ	এবং, ও	رَبِّكَ	আপনার প্রতিপালকের
اَلۡفَتۡحُ	বিজয়	وَاسۡتَغۡفِرۡهُ	এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন
رَاَيۡتَ	আপনি দেখবেন	إِنَّهٗ	নিশ্চয়ই তিনি
اَلنَّاسَ	মানুষ	كَانَ	হন, হলেন, আছেন, রয়েছেন
يَدۡخُلُوۡنَ	তারা প্রবেশ করছে	تَوَّابًا	তাওবা কবুলকারী
فِيۡ	মধ্যে		

অনুবাদ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَالۡفَتۡحُ ۙ﴿۱﴾	১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়
وَرَاَيۡتَ النَّاسَ يَدۡخُلُوۡنَ فِيۡ دِيۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ۙ﴿۲﴾	২. এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন।
فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿۳﴾	৩. তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তিনি তো তাওবা কবুলকারী।

ব্যাখ্যা

সূরা আন-নাসর কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ সূরা। এরপর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু আর কোনো সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। এ সূরাতে মক্কা বিজয়ের পর মানুষের দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা মহানবি (সা.)- এর জন্মভূমি এবং বাসস্থান ছিল। কিন্তু সেখান হতে তাঁকে এবং তাঁর সাহাবিগণকে কাফেররা হিজরত করতে বাধ্য করেছিল। যখন ৮ম হিজরিতে এই মক্কা নগরী বিজয় হলো তখন লোকেরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগল। অথচ এর পূর্বে এক-দুজন করে মুসলমান হতো। মক্কা বিজয়ের পর মানুষের নিকট এ বিষয়টি পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, তিনি আল্লাহর সত্য পয়গম্বর এবং ইসলামই হলো সত্য ধর্ম; যা অবলম্বন ব্যতীত পরকালে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

ইসলামের এ বিজয়ের ফলে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নবুয়তি দায়িত্বের পরিপূর্ণতাও বোঝানো হয়েছে। তাই বিশিষ্ট সাহাবিগণ এ সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত নিকটবর্তী বলে বুঝতে পেরেছিলেন। মহানবি (সা.) -এর দুনিয়াতে আগমন ও অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে বলে এ সূরায় ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সূরা দ্বারা আরও বোঝানো হয়েছে যে, কোনো ব্যাপারে যখন আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেন, তখন অনেক অসাধ্য কাজও সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। তখন আল্লাহর তাসবিহ, প্রশংসা এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনায় অধিকতর মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। উম্মে সালামাহ (রা.) বলেন, এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) উঠাবসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ (সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি) এই তাসবিহ পাঠ করতেন।

শিক্ষা

এ সূরার শিক্ষা নিম্নরূপ:

১. সাহায্য ও বিজয় আসে একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে।
২. আমাদের যাবতীয় কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন।
৩. আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সফলতা লাভ করা যায় না।
৪. কোনো কাজে সফলতা আসলে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত।
৫. যাবতীয় ত্রুটি, অপরাধ বা পাপ কাজের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।
৬. মহানবি (সা.)-নিষ্পাপ ছিলেন। তবুও তাঁকে ইস্তেগফার করতে বলে মহান আল্লাহ মূলত আমাদের তাওবা ইস্তেগফার করতে উৎসাহিত করেছেন এবং শিক্ষা দিয়েছেন।

অতএব, সকল সাওয়াবের কাজ করতে ও পাপ কাজ থেকে বাঁচতে আমরা আল্লাহর সাহায্য চাইব। যখন আমাদের সফলতা আসবে, তখন আমরা আল্লাহর প্রশংসা করব। আর যদি কোনো ত্রুটি হয়ে যায়, এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব।

দলগত কাজ:
শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সূরা আন নাসর তিলাওয়াত করবে। এরপর সূরাটির অর্থ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

সূরা আল-কাফিরুন (سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ)

সূরা কাফিরুন কুরআন মাজিদের ১০৯তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এটিতে মোট ৬টি আয়াত আছে। এ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত আল-কাফিরুন শব্দ (اَلْكَافِرُوْنَ) থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।
এ সূরায় শিরক ও কুফরের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ ও কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এতে মুসলিমদের ইমানের উপর অটল ও অবিচল থাকার তাগিদ রয়েছে। কাফিরদের এ কথা জানিয়ে দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে যে,দ্বীনের ব্যাপারে কাফিরদের সাথে মুসলিমদের সমঝোতার কোনো পথ খোলা নেই। তবে যে যার ধর্ম পালন করবে, এতে কোনো জবরদস্তির স্থান নেই।

শানে নুযূল

ওয়ালিদ ইবন মুগিরা, আস ইবন ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবন আবদুল মোত্তালিব ও উমাইয়া ইবন খালফ প্রমুখ মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তি একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলল: আসুন, আমরা পরস্পরের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদাত করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদাত করব। কাফিরদের এহেন প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাফিরুন অবতীর্ণ হয়।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
قُلْ	তুমি বল/আপনি বলুন	عَابِدُوْنَ	ইবাদাতকারীগণ
يَاَيُّهَا	হে, ওহে	اَعْبُدُ	আমি ইবাদাত করি
اَلْكَافِرُوْنَ	কাফিররা	عَابِدٌ	ইবাদাতকারী
لَا اَعْبُدُ	আমি ইবাদাত করি না	عَبَدْتُّمْ	তোমরা ইবাদাত করে আসছ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
مَا	যার	لَكُمْ	তোমাদের জন্য
تَعْبُدُوْنَ	তোমরা ইবাদাত করছ	دِيْنُكُمْ	তোমাদের দ্বীন
اَنْتُمْ	তোমরা	لِيَ	আমার জন্য

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝	১. বল, ‘হে কাফিররা!
لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝	২. আমি তার ইবাদাত করি না যার ইবাদাত তোমরা করো।
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝	৩. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও, যাঁর ইবাদাত আমি করি।
وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝	৪. এবং আমি তার ইবাদাতকারী নই যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ।
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝	৫. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও, যাঁর ইবাদাত আমি করি।
لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝	৬. তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।’

ব্যাখ্যা

মহান আল্লাহ প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.) কে নির্দেশ দিচ্ছেন, তিনি যেন সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে কাফেরদের সামনে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে প্রকাশ্যে বা গোপনে তারা যাদের ইবাদাত করে থাকে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহর ইবাদাতে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা না থাকার কারণে তারা আল্লাহর ইবাদাতই করে না। শিরকের সাথে মিশ্রিত তাদের ইবাদাতকে কোনো ইবাদাতই বলা চলে না।

এখানে কেবল ঐ সমস্ত কাফিরকে বিশেষভাবে বুঝানো হয়েছে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ জানেন যে, তাদের মৃত্যু কুফর ও শিরকের অবস্থাতেই ঘটবে। কেননা-এ সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর কিছুসংখ্যক মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তারা আল্লাহর ইবাদাত করেছিল। কাফিররা মহানবি (সা.) এর কাছে যখন প্রস্তাব রাখল যে, এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদাত করব এবং এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যের ইবাদাত করবেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, এটা কখনই সম্ভব নয় যে, আমি তাওহিদের পথ পরিত্যাগ করে শিরকের পথ অবলম্বন করে নেব; যেমন তোমরা চাচ্ছ। আর যদি আল্লাহ তোমাদের ভাগ্যে হেদায়াত না লিখে থাকেন, তাহলে তোমরাও তাওহিদ ও আল্লাহর ইবাদাত থেকে বঞ্চিতই থাকবে। যদি তোমরা তোমাদের দ্বীন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো এবং তা ত্যাগ করতে রাজি না হও, তাহলে তার পরিণাম তোমরাই ভোগ করবে। আমার দ্বীন আমার জন্য এবং তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য।

শিক্ষা

১. একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে।

২. কোনো পরিস্থিতিতেই মুসলিমদের জন্য শত্রুর সাথে ধর্মের ব্যাপারে এমন আপস করা যাবে না যা ইসলাম সমর্থন করে না।

৩. এই সূরায় মহান আল্লাহ হক ও বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

দলগত কাজ :
শিক্ষার্থীরা সূরা কাফিরুন শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করবে এবং পরস্পরের মধ্যে এ সূরার শিক্ষা আলোচনা করবে।

সূরা আল-আসর (سُوْرَةُ الْعَصْرِ)

সূরা আল-আসর আল-কুরআনের ১০৩তম সূরা। এটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা মাত্র ৩টি। পবিত্র কুরআনের ছোট সূরাসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। তবে এ সূরার মর্ম ও তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। এ সূরার প্রথমে আল্লাহ তা'আলা আসর বা মহাকালের শপথ করেছেন। এ জন্য এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল-আসর। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবিগণের মধ্যে দুই ব্যক্তি ছিল, তারা পরস্পর মিলিত হলে একজন অন্যজনকে সূরা আসর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। (তাবরানি) ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেছেন, 'যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি সম্পর্কে চিন্তা করত, তবে এটি তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল'। (ইবনে কাসির) অর্থাৎ এ সূরার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে পারলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের পথ লাভ করত। সুতরাং আমরা এ সূরাটি অর্থসহ শিখব। অতঃপর এর তাৎপর্য সম্পর্কে জানব এবং তদনুযায়ী আমল করব।

শানে নুযূল

জাহিলিয়া যুগে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে কালাদাহ ইবনে উসায়েদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কালাদাহ প্রায়ই তার নিকট যাতায়াত করত। আবু বকর (রা.) ইমান গ্রহণের পর একদিন সে তার নিকট এসে বলল, 'হে আবু বকর! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তোমার ব্যবসা-বাণিজ্যে তো ভাটা লেগেছে। আয়-রোজগারের পথ তো প্রায় বন্ধ। তুমি কোন ধারণায় নিমজ্জিত হয়েছ? নিজেদের ধর্মকর্মও হারিয়েছ এবং দুনিয়াও হারিয়েছ। তুমি এখন উভয় দিক দিয়ে পূর্ণরূপে লোকসানে নিপতিত।' আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বললেন, 'হে বোকা! যে লোক আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসুলের অনুগত হয়ে যায়, সে কখনও লোকসানে নিপতিত হয় না। যারা পরকাল সম্পর্কে কোনোই চিন্তাভাবনা করে না মূলত তারাই ক্ষতিগ্রস্ত, তারাই লোকসানে নিপতিত। যারা কেবল জাগতিক উন্নতি লাভের জন্যই সদা চিন্তামগ্ন ও ব্যস্ত থাকে, তারাই একূল-ওকূল উভয় কূলই হারায়।' আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কথার সত্যতা প্রমাণ এবং এ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। (তাফসিরে আজিজি)

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
وَ	শপথ, কসম	اٰمَنُوْا	তারা ইমান এনেছে
اَلْعَصْرِ	সময়, যুগ, কাল, মহাকাল	عَمِلُوْا	তারা আমল করেছে
اِنَّ	নিশ্চয়ই, অবশ্যই	اَلصّٰلِحٰتِ	সৎকর্মসমূহ
اَلْاِنْسَانَ	মানুষ	تَوَاصَوْا	তারা পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে
خُسْرٍ	ক্ষতি	اَلْحَقِّ	সত্য
إِلَّا	ব্যতীত, ছাড়া	اَلصَّبْرِ	ধৈর্য
اَلَّذِيْنَ	যারা		

অনুবাদ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
وَالۡعَصۡرِ ۙ	১. মহাকালের শপথ।
اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِيۡ خُسۡرٍ ۙ	২. নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।
اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ ۙ	৩. কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও
وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ ࣖ	৪. ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

ব্যাখ্যা

সূরা আল-আসর একটি ছোট্ট সূরা হলেও এর মর্মার্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা মহাকালের শপথ করে বলেছেন যে, সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তবে চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ ব্যতীত। সেই চারটি গুণ হলো- ইমান, সৎকর্ম, পরস্পরকে সত্য অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দান।

সূরা আল-আসরের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সময় বা মহাকালের শপথ করেছেন। মানুষের জীবনে সময় অত্যন্ত মূল্যবান। কেননা, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। মানুষ খুব অল্প সময় এই দুনিয়াতে বেঁচে থাকে। এ সময়ের মধ্যেই মানুষকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। যারা দুনিয়াতে সময়ের সদ্ব্যবহার করবে এবং নেক আমল করবে পরকালে তারাই সফলতা লাভ করবে। তাই সময়ের শপথ করে মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের এই ক্ষতি ও ধ্বংস সুস্পষ্ট। কেননা, তারা সময়ের সদ্ব্যবহার করে না, আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে না। যারা এরূপ মনগড়াভাবে জীবনযাপন করবে, তারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, তারা যতক্ষণ জীবিত থাকে ততক্ষণ তাদের দিনরাত মেহনত ও পরিশ্রমের সাথে অতিবাহিত হয়। অতঃপর যখন মৃত্যুবরণ করে তখনও তাদের আরাম ও শান্তি নসিব হয় না। বরং তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।

তৃতীয় ও শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য চারটি আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে যারা এ চারটি কাজ করবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বরং তারা সফলতা লাভ করবে। আর যারা দুনিয়াতে এ কাজগুলো করবে না, তারা অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ

কাজগুলো হলো ইমান আনা, সৎকর্ম করা, সত্যের উপদেশ দেওয়া ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেওয়া।

এ কাজগুলোর প্রথম দুটি কাজ ব্যক্তিগত। অর্থাৎ প্রথমে ইমান আনতে হবে। তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এরপর দ্বিতীয় কাজ হলো ভালো কাজ করা। আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন তা পালন করতে হবে। আর তিনি যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এভাবে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার নামই নেক কাজ।

চারটি কাজের মধ্যে শেষের কাজ দুটি সামাজিক। অর্থাৎ একা একা এ কাজ দুটি করা যাবে না। এর প্রথমটি হলো সমাজের মানুষকে সত্যের উপদেশ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষকে সত্য পথের দিকে ডাকা। তাদের নেক কাজে উৎসাহিত করা, অন্যায় কাজ থেকে তাদের বিরত রাখা ইত্যাদি। সামাজিক দায়িত্বের শেষটি হলো মানুষকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেওয়া। অর্থাৎ বালা-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য, শরিয়তের হুকুম-আহকাম পালন করতে ধৈর্য, পাপাচার বর্জন করতে ধৈর্য, কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেওয়া। মূলত এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে হতাশ ও নিরাশ হওয়া যাবে না। বরং ধৈর্য ধারণ করতে হবে, সত্যের পথে অবিচল থাকতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

শিক্ষা

১. সময় অত্যন্ত মূল্যবান। যারা দুনিয়াতে সময়ের সদ্ব্যবহার করবে এবং নেক আমল করবে পরকালে তারাই সফলতা লাভ করবে।
২. সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তবে চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ ব্যতীত। সেই চারটি গুণ হলো ইমান, সৎকর্ম, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশ দান।
৩. আমরা ইমান আনব এবং নেক কাজ করব। কোনো প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও অনৈতিক কাজ করব না।
৪. আমাদের বন্ধুবান্ধব, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে সত্য ও সুন্দরের দিকে আহ্বান করব। সবাইকে উত্তম চরিত্রবান ও নীতিবান হতে উৎসাহ দেবো।
৫. আমরা সত্যের পথে অবিচল থাকব, বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করব। হতাশ হয়ে কখনও অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করব না।
৬. আমরা পরস্পরকে সৎ কাজে উৎসাহ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেবো।

দলগত কাজ :

শিক্ষার্থীরা সূরা আল আসর শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করবে এবং পরস্পরের মধ্যে এ সূরার শিক্ষা আলোচনা করবে।

সূরা আত-তাকাসুর (سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ)

এ সূরার প্রথম আয়াতে বর্ণিত তাকাসুর শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা তাকাসুর। এটি পবিত্র কুরআনের ১০২তম সূরা। এর অর্থ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা। এটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা ৮টি। রাসুলুল্লাহ (সা.) একদা সাহাবিগণকে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন ক্ষমতা কারও নেই যে সে দৈনিক এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে। উত্তরে তাঁরা বললেন, হ্যাঁ এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনেরই বা আছে? অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তোমাদের কেউ কি সূরা তাকাসুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য, প্রতিদিন এই সূরা একবার পাঠ করা এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করার সমান।' (তাফসিরে মাযহারি)

শানে নুযূল

কুরাইশের শাখা গোত্র ছিল বনু আবদি মানাফ, বনু কুসাই ও বনু সাহম। এদের প্রত্যেক গোত্র অপর গোত্রকে লক্ষ্য করে বলত, কী নেতৃত্ব, কী ক্ষমতা কিংবা জনসংখ্যা, সব দিক থেকেই আমরা তোমাদের উপরে। এতে প্রথমে বনু আবদি মানাফই সবার উপরে প্রমাণিত হলো। শেষে সবাই বলল, আমাদের মধ্যে যারা মারা গেছে তাদেরকেও হিসাব করব। কাজেই তারা কবরস্থানে গিয়ে হাজির হলো এবং কোনটা কার কবর তা বলে গুনতে শুরু করল। এবার বনু সাহমের সংখ্যায় তিন পরিবার বেশি হলো। কেননা, জাহিলি যুগে তাদের জনসংখ্যা বেশি ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে সূরাটি নাজিল হয়।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اَلْهٰكُمُ	তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করেছে, মোহাবিষ্ট করেছে	لَوْ	যদি
التَّكَاثُرُ	প্রাচুর্য, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা	عِلْمَ	জ্ঞান
حَتّٰى	পর্যন্ত, যতক্ষণ না, এমনকি	اَلْيَقِيْنِ	দৃঢ় বিশ্বাস, নিশ্চিত
زُرْتُمُ	তোমরা সাক্ষাৎ করেছ, তোমরা উপনীত হয়েছ, তোমরা মুখোমুখি হয়েছ	اَلْجَحِيْمَ	জাহিম, একটি জাহান্নামের নাম
اَلْمَقَابِرَ	কবরসমূহ	عَيْنَ	চক্ষু, চোখ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
كَلَّا	কখনোই না	يَوْمَئِذٍ	সেদিন
سَوْفَ	অচিরেই, শীঘ্রই	عَنِ	হতে, থেকে, সম্পর্কে
تَعْلَمُوْنَ	তোমরা জানবে	اَلنَّعِيْمِ	নিয়ামত
ثُمَّ	অতঃপর, আবার		

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ	১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রাখে।
حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۗ	২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ	৩. এটা সংগত নয়, তোমরা অচিরেই তা জানতে পারবে।
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۗ	৪. আবার বলি, এটা সংগত নয়, তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে।
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۗ	৫. সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۙ	৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে।
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۗ	৮. আবার বলি, তোমরা অবশ্যই তা চাক্ষুষ প্রত্যয়ে দেখবে।
ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۧ	৯. অতঃপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় ধনসম্পদের মোহ ও প্রতিযোগিতা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই ধনসম্পদ, টাকা-পয়সা ইত্যাদির প্রতি লোভী। প্রাচুর্য লাভের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকা অবস্থাতেই মানুষের মৃত্যু এসে যায়। অথচ সে মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য কোনো প্রস্তুতিই নিতে পারে না। কিন্তু এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা, ধনসম্পদ হলো ক্ষণস্থায়ী বিষয়। এগুলোর প্রতি মোহ মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অথচ আখিরাতের সাফল্য ও কল্যাণ এগুলোর তুলনায় কতই না উত্তম। মানুষের উচিত দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া। মানুষ যদি আখিরাতের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করত, তবে কখনো দুনিয়ার প্রাচুর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতো না।

মৃত্যুর পর মানুষ আখিরাতকে বুঝতে পারবে। আখিরাতের নানা বিষয় প্রত্যক্ষ করবে। অথচ সে তখন কিছুই করতে পারবে না। বরং দুনিয়ায় প্রাপ্ত নিয়ামত সম্পর্কে সে জিজ্ঞেসিত হবে। দুনিয়ার লোভ-লালসা ও অন্যায়-অনৈতিকতার জন্য সে জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে।

শিক্ষা

এ সূরা থেকে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষা লাভ করি। যেমন:

১. সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতি মোহাচ্ছন্ন থাকা উচিত নয়।

২. সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে আখিরাত ভুলিয়ে দেয়।

৩. অন্যায়ভাবে ধনসম্পদ উপার্জনকারী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

৪. আখিরাতে সকল কাজের হিসাব নেওয়া হবে।

অতএব, আমরা ধনসম্পদের প্রতি লোভ-লালসা করব না। বরং বৈধভাবে প্রয়োজনমতো ধনসম্পদ উপার্জন করব। আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনামতো খরচ করব। অন্যায়ভাবে ধনসম্পদ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা করব না।

মুনাজাতমূলক আয়াত

মুনাজাত আরবি শব্দ। এর অর্থ পরস্পর চুপি চুপি কথা বলা। আদবের সাথে কাকুতি-মিনতিসহ আল্লাহ তা'আলার কাছে কোনো কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করাকে মুনাজাত বলে। আমাদের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন সবকিছুর জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট মুনাজাত করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো।' (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত: ৬০) রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন সম্পর্কে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।' (তিরমিযি)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের রব। তিনিই সবকিছু আমাদের দান করেন। দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত নিয়ামত তাঁরই দান। সুতরাং আমাদের উচিত তাঁরই কাছে সবকিছুর জন্য প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলার নিকট কিছু চাওয়ার মাধ্যম হলো মুনাজাত করা। মুনাজাতের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের চাহিদা জানাতে পারি। আল কুরআনে মুনাজাতমূলক বহু আয়াত রয়েছে। এ পাঠে আমরা এরূপ তিনটি মুনাজাতমূলক আয়াত শিখব ও অর্থ জানব। এরপর এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট মুনাজাত করব।

আয়াত- ১

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়া না করো তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।' (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ২৩)

সর্বপ্রথম এ মুনাজাত হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়া (আ.) করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করে জান্নাতে বসবাস করার নির্দেশ দেন। জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সকল নিয়ামত ভোগ করার অনুমতি দেন। শুধু একটি গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেন। কিন্তু আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) শয়তানের প্ররোচনায় ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। তাঁদের এ কাজের জন্য মহান আল্লাহ তাঁদেরকে বেহেশত থেকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেন। দুনিয়ায় এসে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন। তাঁরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে কান্নাকাটি করতে থাকেন। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে তাঁদের উপর্যুক্ত মুনাজাত শিক্ষা দেন। অতঃপর হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এ মুনাজাতের মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দোয়া কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন।

এ আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমরা নানারকম পাপ করে থাকি। আমরা আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে থাকি। এমতাবস্থায় আমাদের উচিত অপরাধসমূহ স্বীকার করা। অতঃপর এ মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি দয়া করবেন এবং আমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন।

আয়াত- ২

رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ۝

অর্থ: 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ থেকে আমাদের প্রতি দয়া করো এবং আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা করো।' (সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১০)

মুনাজাতটি আসহাবে কাহফের যুবকগণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহফে তাঁদের ঘটনা ও মুনাজাত উল্লেখ করেছেন। আমাদের প্রিয়নবি (সা.)-এর আগমনের কয়েক শ বছর পূর্বের ঘটনা। দাকইয়ানুস নামক এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিল। সে ইমানদারদের উপর খুব অত্যাচার করত। তার অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েকজন যুবক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন। তাঁদের সাথে একটি কুকুরও ছিল। তাঁদেরকে আসহাবে কাহফ বলা হয়। তাঁরা গুহাতে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। গুহায় থাকাবস্থায় তাঁরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এ মুনাজাত করেন। আল্লাহ তা'আলাও তাঁদের এ দোয়া কবুল করেন।

পুণ্যবান ব্যক্তিরা কখনোই আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ত্যাগ করেন না। শত অত্যাচারেও তাঁরা যথাযথভাবে মহান আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকেন। এ জন্য প্রয়োজনে নিজেদের ঘরবাড়ি, দেশত্যাগ করতেও পিছপা হন না। আমরাও তাঁদের মতো আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করব। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ছাড়ব না। বরং কোনো অসুবিধা দেখা দিলে আমরা মুনাজাতমূলক এ আয়াতটি পাঠ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব। ফলে তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং আমাদের সকল কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করবেন।

আয়াত- ৩

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۙ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ ۙ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۙ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ۖ

অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ সহজ করে দিন এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।' (সূরা ত্বা-হা, আয়াত: ২৫-২৮)

মিসর দেশে ফিরাউন নামে এক বাদশাহ ছিল। সে ছিল খুবই অত্যাচারী, অহংকারী, দাম্ভিক এবং কুফরিতে চরমভাবে নিমজ্জিত। তার রাজ্য ছিল বিশাল এবং সৈন্য সংখ্যা ছিল অগণিত। বহু বছর ধরে তার শাসন চলে আসছিল। সে এতটাই দাম্ভিক ছিল যে, নিজেকে 'সর্বোচ্চ প্রভু' বলে দাবি করত। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ.) কে প্রেরণ করেন তার নিকট দ্বীন-ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। তখন মুসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দোয়াটি করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন। তাঁর বক্ষকে ইমান ও নবুয়াতের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন, তাঁর দ্বীন প্রচারের কাজকে সহজ করে দিয়েছিলেন এবং তাঁর জিহ্বার জড়তাকে দূর করে দিয়েছিলেন, যাতে মানুষ তাঁর কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে।

আমরাও আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করব যেন তিনি আমাদের বক্ষকে ইমান, সৎকাজ ও জ্ঞানের জন্য প্রশস্ত করে দেন; লেখাপড়াসহ আমাদের সকল ভালো কাজকে সহজ করে দেন এবং আমাদের জিহ্বার জড়তাকে দূর করে দেন–যাতে আমরা সুন্দরভাবে মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারি, মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলতে পারি।

বাড়ির কাজ:
শিক্ষার্থীরা মুনাজাতমূলক আয়াত তিনটি পড়ার টেবিলের সামনে ঝুলিয়ে রাখার জন্য সুন্দর করে লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

আল-হাদিস

আল-হাদিসের পরিচয়

হাদিস (حَدِيْثٌ) আরবি শব্দ। শব্দটি একবচন, বহুবচনে আহাদিস (اَحَادِيْثُ)। এর শাব্দিক অর্থ হলো কথা, বাণী, কাজ, বার্তা, সংবাদ, খবর, বিবরণ ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, মহানবির (সা.)-এর বাণী, কর্ম, কর্মের সমর্থন বা অনুমোদনকে হাদিস বলে। অর্থাৎ নবি হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সা.) জীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন, যা অনুমোদন দিয়েছেন এবং সাহাবিদের যে সমস্ত কাজ ও কথার প্রতি সমর্থন ও সম্মতি দান করেছেন তার সবগুলোই হাদিস।

হাদিসের গুরুত্ব

ইসলামি জীবনদর্শনের মূলভিত্তি আল-কুরআন এবং দ্বিতীয় ভিত্তি আল-হাদিস। আল-কুরআনে জীবনবিধানের মৌলিক নীতিমালা দিয়েছে এবং আল-হাদিসে সেই মৌলিক নীতিমালার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আল-হাদিস হচ্ছে কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা, আল্লাহর রাসুল (সা.) এর জীবনচরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ তথা তাঁর বাণী, কাজ ও নির্দেশনাবলির বিস্তারিত বিবরণ। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে চলতে ফিরতে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ সকল সমস্যার নিখুঁত সমাধান রয়েছে হাদিসের মধ্যে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার জন্য হাদিস অপরিহার্য। মানব জাতিকে ন্যায়নীতি, সত্য ও শান্তির পথে আনতে দিকনির্দেশনা দেয় হাদিস। মুসলমানদের জীবনে হাদিস অধ্যয়ন ও চর্চা খুবই জরুরি।

শরিয়তের উৎস হিসেবে হাদিসের গুরুত্ব

ইসলামি জীবন বিধানের মূল উৎস হলো কুরআন ও হাদিস। পবিত্র কুরআন হলো ইসলামের মৌলিক ভিত্তি এবং হাদিসে বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়নের নমুনা পাওয়া যায়। হাদিস আল-কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা। হাদিস ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় অপরিহার্য উৎস। কুরআনের পরেই হাদিসের স্থান। হাদিস হচ্ছে রাসুল (সা.)-এর জীবনালেখ্য ও কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই ইসলামি শরিয়তে হাদিসের গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্র কুরআনে যেসব নিয়ম-কানুন সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে হাদিসে। উদাহরণস্বরূপ,

সালাত ও সাওমের কথা বলা যেতে পারে। কুরআন শরিফে বলা হয়েছে, সালাত কায়েম করো এবং যাকাত দাও। হাদিসে কীভাবে সালাত আদায় করতে হবে, কখন সালাত পড়তে হবে এবং কী পরিমাণ যাকাত দিতে হবে, কাকে দিতে হবে, কোন কোন সম্পদের যাকাত দিতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা উঠে এসেছে। এ ছাড়া দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা, কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার-আচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি-চুক্তি, বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান পাওয়া যায় হাদিসে। এ ছাড়া মানবাধিকার, প্রাণীর অধিকার, পরিবেশের সংরক্ষণসহ মানব জীবনের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ রয়েছে হাদিসে। এমনকি মানুষের স্বাস্থ্যগত সকল প্রকারের নির্দেশনা রয়েছে হাদিসে।

সর্বোপরি মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের প্রতিটি বিষয় নিখুঁতভাবে পরিচালনা করার জন্য হাদিসের নির্দেশনা একান্ত প্রয়োজন।

কোনো মুসলমান হাদিসকে অস্বীকার করতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা রাসুল (সা.)-এর সকল কাজকে গ্রহণ করতে বলেছেন এবং যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করতে বলেছেন। এ বিষয়ে কুরআন শরিফে ঘোষণা করা হয়েছে,

مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

অর্থ: ‘রাসুল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো।’ (সূরা হাশর, আয়াত: ০৭)

মানবজাতিকে সুপথে পরিচালিত করার বাস্তব নির্দেশনা রয়েছে হাদিসে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন–

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّه

অর্থ: ‘আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, যদি তা শক্তভাবে ধরে রাখো তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবির সুন্নাহ বা হাদিস।’ (মুয়াত্তা মালিক)

হাদিসের প্রকারভেদ

হাদিসের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। মূল বক্তব্য, বর্ণনাকারীর সংখ্যা বিবেচনায় হাদিসের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে শিখব। বর্তমানে আমরা মূল বক্তব্য অনুসারে হাদিসের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে জানব। মূল বক্তব্য অনুসারে হাদিস তিন প্রকার। যথা- কওলি হাদিস, ফেলি হাদিস ও তাকরিরি হাদিস।

(১) **কওলি হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْقَوْلِى)** : যে সব হাদিসে মহানবি (সা.)-এর নিজ বাণী বর্ণিত হয়েছে তাই কওলি হাদিস বা বাণীসূচক হাদিস।

(২) **ফে'লি হাদিস (اَلْحَدِيْثُ الْفِعْلِى)** : যে সব হাদিসে মহানবি (সা.)-এর কাজ, কর্ম, আচার-আচরণের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে এমন ধরনের হাদিসকে ফে'লি হাদিস বা কর্মসূচক হাদিস বলে।

(৩) **তাকরিরি হাদিস (اَلْحَدِيْثُ التَّقْرِيْرِى)** : যে হাদিসে সাহাবিগণের কোনো কথা, কর্ম বা আচার-আচরণের প্রতি মহানবি (সা.)-এর মৌনসম্মতি বর্ণনা করা হয়েছে, সে সকল হাদিসকে তাকরিরি হাদিস বলে।

হাদিস গ্রন্থসমূহ

সিহাহ সিত্তার পরিচয়

সহিহ (صَحِيْحٌ) আরবি শব্দ যার অর্থ হলো বিশুদ্ধ বা নির্ভুল। বহুবচনে সিহাহ (صِحَاحٌ)। আর সিত্তাহ (سِتَّةٌ) অর্থ হলো ছয়। অতএব সিহাহ সিত্তাহর শাব্দিক অর্থ হাদিসের ছয়খানা বিশুদ্ধ গ্রন্থ। মহানবি (সা.)-এর হাদিস সংকলনের অসংখ্য গ্রন্থ থেকে সর্বোত্তম বিশুদ্ধ ছয়খানা গ্রন্থকে 'সিহাহ সিত্তাহ' বলে। এ ছয়খানা হাদিসগ্রন্থ হলো বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ।

(১) **বুখারি:** ইমাম বুখারি (রহ.) ১৬ বছর সাধনা করে বিশ্ববিখ্যাত 'সহিহ আল বুখারি' গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁরই নামানুসারে সহিহ বুখারি নামকরণ করা হয়। ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর সংগৃহীত ছয় লাখের অধিক হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে ৭৭৬১টি হাদিস সন্নিবেশ করেন। তিনি হাদিস সংগ্রহের সময় খুবই আন্তরিক ও সতর্ক ছিলেন। সন্দেহ সৃষ্টি হলে সে হাদিস গ্রহণ করতেন না। তিনি হাদিস গ্রন্থসংকলন করার সময় রোজা রাখতেন, গোসল করতেন এবং দু'রাকাআত এস্তেখারা নামাজ আদায় করতেন। এ জন্যই বিশ্ব দরবারে 'বুখারি' সর্বোচ্চ প্রশংসিত বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

(২) **মুসলিম:** ইমাম মুসলিম (রহ.) ১৫ বছর পরিশ্রম করে 'সহিহ মুসলিম' সংকলন করেন। তাঁর নামানুসারে 'সহিহ মুসলিম' নামকরণ করা হয়। তিনি তিন লাখ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে চার হাজার হাদিস এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেন।

(৩) **আবু দাউদ:** ইমাম আবু দাউদ (রহ.)-এর নামানুসারে 'সুনান আবু দাউদ' নামকরণ করা হয়। ইমাম আবু দাউদ (রহ.) পাঁচ লাখ হাদিস থেকে যাচাই-বাছাই করে চার হাজার আট শত হাদিস এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করেন।

(৪) **নাসাঈ:** ইমাম নাসাঈ (রহ.)-এর নামানুসারে 'সুনানা নাসাঈ' নামকরণ করা হয়। নাসাঈ শরিফে মোট ৪৪৮২টি হাদিস সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

(৫) **তিরমিযি:** ইমাম তিরমিযি (রহ.)-এর নামানুসারে 'জামে' তিরমিযি' নামকরণ করা হয়েছে। তিরমিযি শরিফে পাঁচ লাখ হাদিস থেকে বাছাইকৃত ১৬০০ হাদিস সন্নিবেশিত করেন।

(৬) **ইবনে মাজাহ:** ইবনে মাজাহ (রহ.)-এর নামানুসারে 'সুনান ইবনে মাজাহ' নামকরণ করা হয়েছে। ইবনে মাজাহ (রহ.) কয়েক লাখ হাদিস থেকে মাত্র চার হাজার হাদিস এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন।

মুনাজাতমূলক ৩টি হাদিস

মুনাজাত অর্থ দোয়া, প্রার্থনা ইত্যাদি। মুনাজাত আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় আমল। আল্লাহ চান বান্দা যেন বেশি বেশি প্রার্থনা করে। মুনাজাত একা একা করা যায় আবার কয়েকজন মিলে একত্রিত হয়েও করা যায়। মুনাজাত আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও নবির উপর দরুদ পাঠের মাধ্যমে শুরু করা উত্তম। কীভাবে মুনাজাত করতে হয় তা মহানবি (সা.) শিখিয়ে দিয়েছেন। নিম্নে মুনাজাতমূলক তিনটি হাদিস উপস্থাপন করা হলো,

হাদিস- ১

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

অর্থ : 'হে মহান আল্লাহ! আপনি যেভাবে আমাকে সুন্দর আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে আপনি আমার চরিত্রও সুন্দর করে দিন।' (মুসনাদে আহমাদ)

হাদিস- ২

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

অর্থ : 'হে মহান আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন, আমাকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করুন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন এবং আমাকে জীবিকা দান করুন।' (মুসলিম)

হাদিস- ৩

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

অর্থ : 'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীন তথা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।' (তিরমিযি)

চতুর্থ অধ্যায়

আখলাক

আমরা তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানারকম কাজ করে থাকি। একটু চিন্তা করে দেখো তো এ বছর এখন পর্যন্ত তুমি যে সকল কাজ করেছ, সেগুলোর মাঝে এমন কোনো কাজ রয়েছে কিনা যেগুলোর মাধ্যমে নৈতিক বা মানবিক গুণাবলি প্রকাশ পায়? নৈতিক বা মানবিক গুণাবলি সম্পর্কে যদি তোমার কোনো ধারণা না থাকে তাহলেও কোনো সমস্যা নেই। চিন্তা করে দেখো, এ বছর তুমি কি কি এমন কাজ করেছ যেগুলো তোমার কাছে মনে হয়েছে অনেক ভালো কাজ। সেগুলোই চিন্তা করে বের করে সহপাঠী বন্ধুদের সাথে আলোচনা করো। শিক্ষক তোমাদের এই বিষয়ে আরও সহায়তা করবেন। আর এই অধ্যায়ের পাঠ থেকে তুমি এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে পারবে। তাই পাঠে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসারে কিছু কাজ সম্পন্ন করে ফেলো।

আল-আখলাক

চরিত্র মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। একজন শিশুকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলতে হলে তার মধ্যে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে হবে। সাধারণত বিনয়, নম্রতা, সততা, ধৈর্য, ক্ষমা, তাকওয়া, ওয়াদা পালন করা, আমানত রক্ষা করা, সৃষ্টির সেবা করা এগুলো মানুষের চরিত্রের উত্তম দিক। অপরদিকে হিংসা, বিদ্বেষ, সুদ, ঘুষ, ক্রোধ, লোভ-লালসা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া ও অসদাচরণ করা মানুষের চরিত্রের মন্দ দিক। কুরআন মাজিদ ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন–

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اِسْمَهُ وَاَدَبَهُ

অর্থ : 'কারও সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে যেন তার একটি সুন্দর নাম রাখে এবং উত্তমরূপে তাকে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়।' (বায়হাকি)

আখলাক (اَلْأَخْلَاقُ) একটি আরবি পরিভাষা। এটি 'খুলুকুন' (خُلُقٌ) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হলো চরিত্র, স্বভাব, আচার-আচরণ, ব্যবহার, সদাচার, সৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যদিয়ে যেসব আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং স্বভাবের প্রকাশ পায় সেসবের সমষ্টিই হলো আখলাক। এককথায়, মানুষের আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা ও দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যদিয়ে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় তা-ই আখলাক বা চরিত্র।

শব্দগত দিক বিবেচনায় মানুষের ভালো ও মন্দ উভয় দিক মিলেই চরিত্র। কিন্তু প্রচলিত অর্থে আখলাক শব্দটি খারাপ চরিত্র বুঝায় না; মানুষের মার্জিত, সুন্দর, নির্মল ও উত্তম আচরণকেই বুঝায়। যেমন আমরা মন্দ চরিত্রের লোককে চরিত্রহীন বলে থাকি। এর অর্থ এই নয় যে, তার কোনো চরিত্র নেই। কেননা, ভালো হোক, মন্দ হোক তার এক ধরনের চরিত্র রয়েছে। তাই এখানে চরিত্রহীনতার অর্থ হলো ভালো চরিত্র না থাকা। অতএব মানুষের ভালো ও মন্দ দিক বিবেচনায় আখলাক বা চরিত্র দুই প্রকার। যথা:

১. আখলাকে হামিদাহ (اَلْأَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ) তথা প্রশংসনীয় চরিত্র বা উত্তম চরিত্র;

২. আখলাকে যামিমাহ (اَلْأَخْلَاقُ الذَّمِيْمَةُ) তথা নিন্দনীয় চরিত্র বা মন্দ চরিত্র।

আখলাকে হামিদাহ (প্রশংসনীয় চরিত্র)

আমরা জেনেছি যে, আখলাক (اَلْأَخْلَاقُ) অর্থ হলো চরিত্র বা স্বভাব। আর হামিদাহ (الْحَمِيْدَةُ) শব্দের অর্থ প্রশংসনীয়। অতএব আখলাকে হামিদাহ (اَلْأَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ) অর্থ প্রশংসনীয় চরিত্র। আখলাকে হামিদাহ তথা প্রশংসনীয় চরিত্রের অপর নাম হলো আখলাকে হাসানাহ বা উত্তম চরিত্র। মানুষের সামগ্রিক আচার-আচরণ, চিন্তা-চেতনা ও দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে উত্তম স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় তা-ই আখলাকে হামিদাহ (اَلْأَخْلَاقُ الْحَمِيْدَةُ) বা উত্তম চরিত্র।

ইসলামে মানব চরিত্রের যে সব মহৎ গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোই হলো আখলাকে হামিদাহ বা উত্তম চরিত্র। সাধারণত বিনয়, নম্রতা, ধৈর্য, ক্ষমা, তাকওয়া, ওয়াদা পালন করা, সততা-সত্যবাদিতা, আমানত রক্ষা করা, পরোপকার, পরমতসহিষ্ণুতা, শিষ্টাচার, শালীনতাবোধ, নিজের কাজ নিজে করা, পরিচ্ছন্ন থাকা, সৃষ্টির সেবা করা, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, দেশপ্রেম ও সমাজসেবা প্রভৃতি গুণাবলিই আখলাকে হামিদাহ বা উত্তম চরিত্র।

পৃথিবীর সকল নবি-রাসুল ও মহাপুরুষগণ মানবজাতিকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মহানবি (সা.) কে মহান চরিত্রের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। তাই রাসুলুল্লাহ (সা)-এর জীবনাদর্শই হলো প্রশংসনীয় চরিত্র বা উত্তম চরিত্রের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে এ কথা ঘোষণা করে বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ :'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১)

একারণেই মানুষকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসুলকে পাঠিয়েছেন। মহানবি (সা.) তাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

অর্থ : 'আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।' (মুসনাদে আহমদ)

আখলাকে হামিদাহ-এর গুরুত্ব

উত্তম চরিত্র মানবজীবনের সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আখলাকে হামিদাহ-এর গুরুত্ব অনেক। মূলত আখলাকে হামিদাহ বা প্রশংসনীয় চরিত্রের উপরই সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সফলতা নির্ভর করে। একজন উত্তম স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তি যেমন সমাজে শ্রদ্ধাভাজন ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে থাকেন, তেমনি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছেও তিনি প্রিয় হয়ে থাকেন। বিপরীত দিকে একজন অসৎ ও মন্দ চরিত্রের লোক সমাজে ঘৃণার পাত্র এবং আল্লাহর নিকট অপ্রিয় হয়ে থাকে।

আখলাকে হামিদাহ হলো মৌলিক মানবীয় গুণাবলির সমষ্টি। এটি মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এটি নষ্ট হয়ে গেলে ব্যক্তির আত্মমর্যাদা ও সম্মান কিছুই থাকে না। চরিত্রের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই। টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত কিংবা স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেলে তা আবার ফিরে পাওয়া যায়; কিন্তু চরিত্রে একবার কলঙ্ক লাগলে তা আর দূর করা যায় না। এ জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র বা আখলাক সর্বোৎকৃষ্ট।' (বুখারি ও মুসলিম)

উত্তম চরিত্র ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস। আখিরাতে কল্যাণ লাভও আখলাকে হামিদাহ-এর উপর নির্ভর করে। এর মাধ্যমে পরম পুণ্য অর্জন করা যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

অর্থ : 'কিয়ামতের দিন যে জিনিসটি মুমিনের পাল্লায় সবচেয়ে ভারি হবে সেটি হলো উত্তম চরিত্র।' (আবু দাউদ)

উত্তম চরিত্র একজন পরিপূর্ণ মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। মুমিনদের মাঝে পূর্ণাঙ্গ ইমানের অধিকারী তারাই, যারা সুন্দর ও প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী। তাই এটি ইমানের পূর্ণতা দেয়। এ ছাড়া উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি মহান আল্লাহর ভালোবাসা লাভে ধন্য হয়। ফলে তার ইহকালীন ও পরকালীন অফুরন্ত কল্যাণ সাধন হয়। সর্বোপরি উত্তম চরিত্র জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের অন্যতম উপায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যার গঠন ও স্বভাব সুন্দর করেছেন, দোযখের অগ্নি তাকে ভক্ষণ করবে না।' (তাবারানি ও বায়হাকি)

আখলাকে হামিদাহ অর্জনের উপায়

মহান আল্লাহর হুকুম পালনের মাধ্যমে আখলাকে হামিদাহ অর্জন করা যায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে যে সকল কাজ করতে বলেছেন, সে সকল কাজ করা এবং যে সকল কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সে সকল কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া সম্ভব। এককথায় মানবীয় মহৎ গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমেই আখলাকে হামিদাহ অর্জিত হয়। যেমন, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আনা, তাঁদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, পিতামাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের কথা মান্য করা, সত্য বলা, ধৈর্য ধারণ করা, কর্তব্যপরায়ণ হওয়া, ওয়াদা পালন করা, আমানত রক্ষা, কথাবার্তায় শালীনতা বজায় রাখা, সৃষ্টিজীবের সেবা করা, সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, অসহায়দের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, মিথ্যা না বলা, প্রতারণা না করা, হিংসা-দ্বেষ থেকে বেঁচে থাকা, ধূমপান পরিহার করা, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা, দয়া ও ক্ষমা করা, বন্ধুবান্ধবের সাথে আন্তরিক হওয়া, প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা, রোগীর সেবা করা, বেশি বেশি কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করা প্রভৃতি গুণ অর্জনের মাধ্যম আখলাকে হামিদাহ অর্জন করা যায়।

বস্তুত দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভের জন্য প্রত্যেক মানুষের উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় মানবজীবন ব্যর্থতা ও গ্লানিতে পরিপূর্ণ হবে।

বিনয় ও নম্রতা

বিনয় ও নম্রতা মানুষের অন্যতম মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বিনয়ী ব্যক্তিকে মানুষ যেমন ভালোবাসেন, তেমনি আল্লাহও তাকে অনেক ভালোবাসেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন বিনয় ও নম্রতার মূর্তপ্রতীক। তিনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

বিনয় ও নম্রতার পরিচয়

বিনয় ও নম্রতা দুটি সমার্থক শব্দ। বিনয় শব্দের অর্থ হলো– নম্রভাব, নম্রতা, কোমলতা, মিনতি ইত্যাদি। আর নম্রতা শব্দের অর্থ হলো বিনীত, ঔদ্ধত্যহীন, নিরহংকার, অবনত, নরম, কোমল, শান্ত-শিষ্ট ইত্যাদি। এ দুটি শব্দের বিপরীত শব্দ হলো– ঔদ্ধত্য, কঠোরতা, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি। কথাবার্তা, কাজ-কর্ম, চাল-চলন ও আচার-আচরণে অন্যের তুলনায় নিজেকে ছোট ও ক্ষুদ্র মনে করা এবং অন্যদেরকে বড় ও সম্মানিত মনে করাই বিনয়। ইসলামি পারিভাষায় বিনয় হলো, নিজেকে সৃষ্টি জগতের মধ্যে উঁচু মর্যাদার অধিকারী মনে না করা এবং নিজের চেয়ে অন্যকে কোনো অবস্থায় নিকৃষ্ট মনে না করা। সর্বোপরি মানুষ ও মহান আল্লাহর প্রত্যেক সৃষ্টি জীবকে স্ব-স্ব সম্মান প্রদান করার নামই বিনয় ও নম্রতা।

বিনয় ও নম্রতার গুরুত্ব

বিনয় মানবজীবনের একটি অত্যন্ত মহৎ গুণ এবং চারিত্রিক ভূষণ। যার বিনয় ও নম্রতা রয়েছে সে দুনিয়া ও আখেরাতের অফুরন্ত কল্যাণ লাভে ধন্য হবে।

বিনয় আল্লাহর পছন্দনীয় একটি গুণ

বিনয় আল্লাহর নিকট খুবই পছন্দনীয় একটি গুণ। ব্যক্তির কথাবার্তা, আচার-আচরণ, লেন-দেন, ওঠা-বসায় এমনকি হাঁটা-চলায় বিনয় প্রকাশ পায়। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পরম করুণাময়ের (আল্লাহর) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে।'(সূরা ফুরকান, আয়াত: ৬৩)

কোমলতা ও নম্রতা আল্লাহর বিশেষ গুণ

বিনয় ও নম্রতা আল্লাহর একটি বিশেষ গুণ। তিনি যেমন নম্রতা ও বিনয় অবলম্বনকারী তেমনি কোমলতা ও বিনয়ী ব্যক্তিকে তিনি ভালোবাসেন এবং তাকে অফুরন্ত কল্যাণ দান করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ

অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা বিনম্র, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। (মুসলিম)

মর্যাদা লাভের একটি বিশেষ সোপান

বিনয় ও নম্রতা মর্যাদা লাভের একটি বিশেষ সোপান। সমাজে বিনয়ী ব্যক্তিকে সবাই পছন্দ করে ও সম্মান দেখায়। কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিনয়ী হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেন। তাই লেনদেনসহ সর্বপ্রকার আচার-আচরণে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেন, 'আর কেউ আল্লাহর জন্য বিনয়ী হলে, আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন।' (মুসলিম)

এটি মহান আল্লাহর নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা কথাবার্তা, কাজকর্ম, চালচলন ও আচার-আচরণে ঔদ্ধত্য ও অহংকার ত্যাগ করে বিনয়ী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ধীর-স্থির ও নম্রতা অবলম্বনপূর্বক সংযত হয়ে চলাফেরা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۭ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۝

অর্থ: 'সংযত হয়ে চলাফেরা করো এবং তোমার কণ্ঠস্বরকে সংযত রাখো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।' (সূরা লোকমান, আয়াত: ১৯)।

মুমিনের বৈশিষ্ট্য

বিনয় ও নম্রতা একজন মুমিনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) মুমিনের প্রশংসা করে বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি নম্র ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে পাপী মানুষ ধূর্ত ও চরিত্রহীন হয়।' (তিরমিযি)

বিশ্বনবি (সা.)-এর চরিত্রে বিনয় ও নম্রতার অনন্য দৃষ্টান্ত

বিশ্বনবি মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন বিনয় ও নম্রতার অনন্য প্রতীক। চরম বিপদেও তাঁর মাঝে ফুটে উঠত বিনয় ও নম্রতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর বিনয় ও নম্রতার কারণে তাঁকে কুরআন মাজিদে কোমল হৃদয়ের অধিকারী হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৫৯) তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল। তিনি তবুও গর্ব-অহংকার পছন্দ করতেন না। তিনি বলেন, 'কিয়ামতের দিন আমি বনি আদমের নেতা হব, তবে এতে আমার কোনো গর্ব নেই। আমার হাতে প্রশংসার ঝান্ডা থাকবে, এতেও আমার কোনো গর্ব নেই। সেদিন আদম (আ.) সহ সকল নবি-রাসুল আমার ঝান্ডার নিচে সমবেত হবেন এবং আমিই সর্বপ্রথম জমিন থেকে উত্থিত হব, এতেও আমার কোনো গর্ব নেই।' (তিরমিযি)

আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর বিনয় ও মহানুভবতা কত উঁচু মানের ছিল তা একটি ঘটনা থেকে অনুধাবন করা যাবে। ঘটনাটি ছিল এমন–

একবার প্রিয়নবি (সা.) ইয়াহুদি ধর্মযাজক যায়েদ ইবনে সানাহ-এর নিকট থেকে কিছু ধার নিয়েছিলেন। ধার পরিশোধের সময় তিনদিন বাকি থাকতেই সে ইয়াহুদি ব্যক্তি বিশ্বনবি (সা.)-এর কাপড় টেনে ধরে। এ সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত উমর (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে হাঁটছিলেন। সে বলে ওঠে, 'তোমরা বনি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর; ঋণ পরিশোধে বড়ই টালবাহানা করছ!' হযরত উমর (রা.)-এর মতো একজন বীরের সামনে প্রিয় নবির সঙ্গে ইয়াহুদির এমন আচরণ তিনি সহ্য করতে পারেননি! রাগে গর্জে ওঠেন তিনি। হযরত উমর (রা.) এর রাগ ও গর্জন দেখে প্রিয়নবি (সা.) হাসলেন এবং কোমল কণ্ঠে বললেন, হে উমর! এ মানুষটি তোমার কাছে উত্তম আচরণ পাওয়ার যোগ্য ছিল। কেননা, আমি এবং সে দুজনই তোমার কাছে অন্য কিছু আশা করছিলাম। তাহলো এই যে, তুমি আমাকে সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করতে বলবে এবং তাকেও ভদ্রোচিতভাবে পাওনা চাইতে পরামর্শ দিবে। পরক্ষণেই প্রিয়নবি (সা.) জানালেন যে, আসলে ঋণ পরিশোধের সময় এখনও তিন দিন বাকি। তারপর তিনি উমর (রা.) কে নির্দেশ দিলেন, 'তার পাওনা পরিশোধ করে দাও এবং এ তিন দিনের হিসেবে তাকে আরও ৩০ সা পরিমাণ বাড়িয়ে দাও।' রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ মহানুভবতা ইয়াহুদির মনে দাগ কাটল। ইয়াহুদি ব্যক্তি বুঝতে পারল, তার আচরণটাই অন্যায় হয়েছে। কেননা, সময়ের আগে সে পাওনা চাইতে পারে না। তাছাড়া তার পাওনা চাওয়ার ধরন এবং আচরণও খুব খারাপ ছিল। অথচ খারাপ আচরণের পরেও প্রিয়নবি (সা.) তার সাথে উত্তম আচরণ করলেন এবং তার পাওনার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিতে বললেন। এতে তার চিন্তার জগতে পরিবর্তন এলো। অবশেষে মহানবি (সা.)-এর মহানুভব আদর্শ ও বিনয়ী আচরণে বদলে গেল তার মন। ইসলাম গ্রহণ করে চিরজীবনের জন্য ধন্য হলেন তিনি।' (মুসতাদরাক আল-হাকিম)

এটি ছিল বিশ্বনবি (সা.) এর মহানুভবতা ও অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যে আদর্শ ও সৌন্দর্য দেখে ইয়াহুদি যায়েদ ইবনে সানাহ ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

বিনয় ও নম্রতা মানবীয় মহৎগুণাবলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি গুণ। এগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন। তাছাড়া একজন বিনয়ী ব্যক্তি সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র হন। পাশাপাশি তিনি পরকালেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভে ধন্য হবেন। তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ঔদ্ধত্য ও অহংকার পরিহার করে বিনয়ী ও নম্র হতে হবে।

ক্ষমা

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। ক্ষমার আরবি প্রতিশব্দ আল-আফ্উ (اَلْعَفْوُ)– এর অর্থ মাফ করা, ক্ষমা করা, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা। ইসলামের পরিভাষায় অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিশোধ গ্রহণ করার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তার প্রতি ভ্রাতৃত্ব সহনশীলতা ও উদারতা প্রদর্শন করাই ক্ষমা।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মহান আল্লাহ অত্যন্ত ভালোবেসে মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিনিয়ত আলো-বাতাসসহ অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে তাদের লালন-পালন করছেন। তাই তাদের দায়িত্ব হলো এ সকল নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মহান আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে জীবন পরিচালনা করা। কিন্তু বহুসংখ্যক মানুষ তাঁকে ও তাঁর দেওয়া জীবন বিধানকে কেবল অস্বীকার করে না বরং বিরুদ্ধাচরণ করে এবং শিরকের ন্যায় জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন কিন্তু তা করেন না। পরে যখন নিজেদের ভুল বুঝে পাপের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তখন ক্ষমা করে দেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ

অর্থ: 'তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন।' (সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২৫)

মহান আল্লাহ নিজে ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। তাই তিনি তাঁর প্রিয় রাসুলকে ক্ষমার আদর্শ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন–

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ○

অর্থ: 'আপনি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলুন।' (সূরা আ'রাফ, আয়াত: ১৯৯)

মহান আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলির অন্যতম একটি গুণ হলো ক্ষমাশীলতা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে তাঁর 'ক্ষমা' গুণটির কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৭৩)

ক্ষমা নবি-রাসুলগণের একটি বিশেষ গুণ। পবিত্র কুরআনে এটিকে নবি-রাসুলগণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আমাদের এই মহৎ গুণটি অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। কোনো মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা অধীনস্থ লোকজন ভুল করলে তাদের ক্ষমা করতে হবে। হযরত আবু বকর (রা.) এর নিকট আত্মীয় ছিলেন হযরত মিসতাহ ইবনে উসাসাহ। তাকে হযরত আবু বকর (রা.) সাহায্য সহযোগিতা করতেন। এমনকি মিসতাহ আবু বকর (রা.) এর সাথে তার বাড়িতেই বসবাস করতেন। যখন মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবন উবাই হযরত আবু বকর তনয়া উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) এর উপর অপবাদ আরোপ করে, তখন মিসতাহও এতে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তখন মনে কষ্ট পেলেন এবং শপথ করে বসলেন আর মিসতাহকে সাহায্য করবেন না। মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে এই বিষয়টি পছন্দ হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাযিল করে আচরণের সংশোধন করার নির্দেশ দিলেন এবং ক্ষমার আদর্শ গ্রহণ করতে বললেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন–

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ط

অর্থ: 'তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে।' (সূরা নূর, আয়াত: ২২)

যারা ক্ষমার এই মহান গুণটি নিজেদের মধ্যে আয়ত্ত করে নেন মহান আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন এবং তাদের মর্যাদাও বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত– একবার এক লোক এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলল আমাদের গোলাম ও কর্মচারীরা তো ভুল-ত্রুটি করে থাকে; তাদেরকে আমরা কতবার ক্ষমা করব? উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) কিছু না বলে চুপ রইলেন। লোকটি আবার প্রশ্ন করল। এবারও রাসুলুল্লাহ (সা.) চুপ রইলেন। লোকটি যখন তৃতীয়বার প্রশ্ন করল। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন–

اُعْفُوْا عَنْهُ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

অর্থ: 'প্রতিদিন তাকে সত্তর বার মাফ করে দেবে।' (আবু দাউদ)

আমাদের প্রিয়নবি (সা.) ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক। তিনি তাঁর চরম শত্রুকেও অবলীলায় ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইসলাম প্রচারের জন্য তায়েফ গমন করলে সেখানকার অধিবাসীরা মহানবির প্রতি অসদাচরণ করে, পাথর মেরে শরীর রক্তাক্ত করে দেয়। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন হযরত জিবরাইল (আ.) পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতাকে সাথে নিয়ে আসেন এবং বলেন যে, আপনি হুকুম দিলে এখনই দুই পাহাড়ের মাঝে ফেলে তাদেরকে পিষে মারা হবে। কিন্তু তিনি তাদের জন্য দোয়া করে বললেন– 'হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হিদায়াত দান করুন। কেননা তারা জানেনা যে আমি আল্লাহর রাসুল।' মহানবি (সা.) এভাবে তায়েফবাসীদের হাসিমুখে ক্ষমা করে দেন।

একদা মহানবি (সা.) বনু গাতফানের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মাহারিবে খাসফা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। কাফিরেরা মুসলমানদের অসতর্কতার সুযোগ খুঁজছিল। মহানবি (সা.) তখন একটি গাছের নিচে আরাম করছিলেন। চুপিসারে জনৈক কাফির তরবারি নিয়ে মহানবি (সা.) এর কাছে এসে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ! তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। মহানবি তরবারিটি তুলে নিলেন এবং বললেন, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? রাসুলুল্লাহ তাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলেন। সে তার সাথিদের কাছে গিয়ে বলল, আমি সর্বোত্তম ব্যক্তির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। (বুখারি ও মুসলিম)

রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন ক্ষমার অনন্য নজির স্থাপন করেন। এদিন মহানবি (সা.) তার প্রাণের শত্রু মক্কার কাফির-মুশরিকদের ক্ষমা করে ঘোষণা করলেন 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তোমরা স্বাধীন-মুক্ত।' এ ঘোষণার পর মক্কার কাফিরেরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষমার এরূপ দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যায় না।

ক্ষমা করলে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া যায়, আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করা যায়। সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও ভালোবাসা গভীর হয়। মহানবি (সা.) এর সুপারিশ পাওয়া যায়। মুমিনের গুণাবলি অর্জিত হয়। অপরাধী লজ্জিত হয়ে অপরাধ ছেড়ে দেয়, চরম শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়। তাই আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই মহৎ গুণের পরিচর্যা করব।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

মানব চরিত্রের উত্তম গুণাবলির অন্যতম হলো ধৈর্য। ধৈর্যের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'সবর'। এর আভিধানিক অর্থ হলো সহিষ্ণুতা, সহ্য করার ক্ষমতা, দৃঢ়তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বিরত থাকা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর আদেশসমূহকে পালন করা। আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকাই হলো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আল বাকারাহ, আয়াত: ১৫৩)।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, 'সবর দুই ধরনের, একটি হচ্ছে বিপদের সময় সবর করা। অপরটি হলো আল্লাহর নাফরমানি (অবাধ্যতা) থেকে বেঁচে থাকার জন্য কষ্ট সহ্য করা। (তাফসিরুল কুরআনিল আজিম) পবিত্র কুরআনুল কারিমের অনেক জায়গায় সবর শব্দটি এসেছে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধমে সাহায্য প্রার্থনা করো।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ৪৫) সবর প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেছেন, 'ধৈর্য হলো একটি আলোকবর্তিকা।' (মুসলিম)

তাৎপর্য

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে শান্তি, স্থিতিশীলতা, সুখি ও সহাবস্থানের জন্য সবরের বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের অফুরন্ত প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে—

إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

অর্থ: 'অবশ্যই ধৈর্যশীলগণকে তাদের প্রতিদান অগণিতভাবে দেওয়া হবে।' (সূরা যুমার,আয়াত-১০)

ধৈর্য হলো সকল কল্যাণের উৎস। যেমন মহানবি (সা.) বলেছেন, 'ধৈর্যের চেয়ে বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু কখনও তোমাদেরকে দান করা হবে না।' (বুখারি) আপাত দৃষ্টিতে সবর করা কঠিন হলেও এর পরিণাম সুমিষ্ট। ফারসি কবি ও দার্শনিক মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি বলেছেন, 'ধৈর্য মানে কাঁটার দিকে তাকিয়ে গোলাপকে দেখা। রাতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দিনের আলোকে দেখা।' মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিপদ-মুসিবত, সফলতা-ব্যর্থতা, জয় ও পরাজয় থাকবেই। আমরা যদি হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব জালিম শাসক নমরুদ যখন ইব্রাহিম (আ.)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল তখন তিনি ধৈর্যহারা হননি। একইভাবে হযরত আইয়ুব (আ.) যখন কঠিন ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শরীর থেকে মাংস খসে পড়েছিল, তখনও তিনি ধৈর্য না হারিয়ে মহান আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা রাখেন। আমাদের প্রিয় মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর পবিত্র জীবনে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

এ ছাড়া দৈনন্দিন জীবনে পালনীয় ইবাদাতের ক্ষেত্রেও সবর করতে হয়। ধৈর্যধারণ করতে হলে প্রয়োজন দৃঢ় ইমান ও খালেস তাওয়াক্কুল (একনিষ্ঠ ভরসা)। সুতরাং আমরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করব, তাহলেই আমাদের জীবন হবে সুন্দর ও সার্থক।

ওয়াদা পালন

মানবজীবনে ওয়াদা পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ মহৎ গুণ। ওয়াদা একটি আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ প্রতিজ্ঞা করা প্রতিশ্রুতি দেওয়া, কথা দেওয়া, অঙ্গীকার করা, চুক্তি ইত্যাদি। আরবিতে এটিকে আল-আহদও (اَلْعَهْدُ) বলা হয়। আর ইসলামি পরিভাষায় কারও সাথে কোনো অঙ্গীকার করলে, কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে অথবা কাউকে কথা দিলে বা কারও সাথে কোনো চুক্তি করলে তা সঠিকভাবে পালন করাকে ওয়াদা পালন বলা হয়।

গুরুত্ব

ওয়াদা পালন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। এটি আখলাকে হামিদাহ বা প্রশংসনীয় গুণাবলির অন্যতম গুণ। ওয়াদা রক্ষাকারীকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন। দুনিয়ায় মানুষগণও তাকে সম্মান করেন, ভালোবাসেন। সকলে তার প্রতি আস্থা রাখেন। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। তাই মহান আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদের ওয়াদা পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ط

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।' (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ১)

ওয়াদা বা অঙ্গীকার পালন করা আল্লাহ তা'আলার একটি গুণ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার সাথে যখন যে ওয়াদা করেন সেগুলো তিনি যথাযথভাবে পালন করেন। তিনি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخۡلِفُ الۡمِيۡعَادَ ۠

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯)

এটি মুমিনের অন্যতম মহৎ গুণ। কেননা এই গুণ অর্জন না করলে কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে না। মহানবি (সা.) বলেন,

لَا دِيۡنَ لِمَنۡ لَا عَهۡدَ لَهٗ

অর্থ: 'যে ওয়াদা পালন করে না, তার দ্বীনদারি নেই।' (মুসনাদে আহমদ)

ওয়াদা পালন করা মুমিনের জন্য ঋণ পরিশোধ করার সমান। ঋণ পরিশোধ করা যেমন একান্ত বাধ্যতামূলক তেমনি ওয়াদা পূরণ করাও অনিবার্য বিষয়। মহানবি (সা.) বলেন,

عِدَةُ الۡمُؤۡمِنِ دَيۡنٌ

অর্থ: 'মুমিনের ওয়াদা ঋণস্বরূপ।' (কানজুল উম্মাল)

তাই ওয়াদা রক্ষা করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কেয়ামতের দিন অঙ্গীকারের ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছে সকলকে জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاَوۡفُوۡا بِالۡعَهۡدِ ۚ اِنَّ الۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔوۡلًا ۠

অর্থ: 'আর তোমরা ওয়াদা পূরণ করো। অবশ্যই ওয়াদার ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে।' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৩৪)

এখানে ওয়াদা বলতে শুধু আল্লাহর সাথে কৃত বান্দার অঙ্গীকারই নয় বরং মানুষের পারস্পরিক ওয়াদাকেও বুঝায়। পরস্পরের ওয়াদা পূর্ণ না করা মুনাফিকের লক্ষণ। আর মুনাফিকের আবাস হলো জাহান্নাম। মহানবি (সা.) বলেন, 'মুনাফিকদের লক্ষণ তিনটি: কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানতের খেয়ানত করে।' (বুখারি)

ওয়াদা পালন নবি-রাসুলগণের অনন্য বৈশিষ্ট্য। আমাদের প্রিয়নবি (সা.) সর্বদা ওয়াদা রক্ষা করতেন। তিনি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেননি। সারা জীবন তিনি যাকে যে ওয়াদা করেছেন সব ওয়াদা পালন করেছেন। তার চরম শত্রুরাও বলতে পারেনি যে, মুহাম্মাদ (সা.) ওয়াদা করে তা পালন করেননি।

তাই আমরা সবসময় ওয়াদা পালন করব। কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করব না। এমন কোনো ওয়াদা করব না যা পালন করা কঠিন। যদি ওয়াদা করে ফেলি তাহলে প্রাণপণ চেষ্টা করব তা রক্ষা করার। তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

আমানত রক্ষা করা

যেসব উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণাবলি মানুষকে আলোকিত ও মহান করে তোলে, আমানত রক্ষা সেগুলোর মধ্যে প্রধান ও অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ। এ গুণটি পার্থিব জগতে মানুষের সম্মান বৃদ্ধি করে। আখিরাতে মুক্তি ও অফুরন্ত কল্যাণ লাভে সহায়তা করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) কে তাঁর এ মহৎ গুণের কারণে মক্কার কাফির-মুশরিকরা আল-আমিন উপাধিতে ভূষিত করেন।

আমানত (اَلْاَمَانَةُ)-এর আভিধানিক অর্থ

আমানত (اَلْاَمَانَةُ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো বিশ্বস্ততা, আস্থা, নিরাপত্তা ও আশ্রয় ইত্যাদি। তবে আমানত শব্দটি গচ্ছিত রাখা অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়। আমানত শব্দটি আরবি হলেও আমাদের কাছে এর অর্থ অনেক পরিচিত। আমানতের বিপরীত অর্থ খেয়ানত য়ানত করা। কোনো অর্থসম্পদ, বস্তু-সামগ্রী অন্য কারও কাছে গচ্ছিত রাখাকে আমরা আমানত বুঝি। গচ্ছিত রাখা বস্তু বা সম্পদ তার মালিকের কাছে সযত্নে যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেওয়াই আমানত রক্ষা করা। যে আমানতের সংরক্ষণ করে এবং তা যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেয়, তাকে আল-আমিন বলা হয়।

আমানত ব্যাপক অর্থবোধক একটি বিষয়। আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই আমানত রয়েছে। কথায়, কাজে, পরামর্শে, গোপনীয়তা রক্ষায়, ইবাদাতে, চাকরিতে, নেতৃত্ব ও পদমর্যাদায় আমানত রয়েছে। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও আমানত রয়েছে। জীবনের সর্বস্তরে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই এ আমানত পালন করা সম্ভব হবে।

আমানতের গুরুত্ব

আমানত রক্ষা করা একটি মহৎ গুণ। সমাজজীবনে আমানত রক্ষা করার গুরুত্ব অনেক। আমানত রক্ষাকারীকে সমাজের সবাই ভালোবাসে ও বিশ্বাস করে। আর খেয়ানতকারীকে সমাজের কেউ ভালোবাসে না, বিশ্বাসও করে না বরং সবাই তাকে ঘৃণা করে। তাই আমানত রক্ষা করার জন্য কুরআন মাজিদ ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কুরআন মাজিদে আমানত রক্ষা প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ

অর্থ: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ তার মালিকের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দাও।’ (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮)।

আমানত রক্ষা করা প্রকৃত মুমিনের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যারা আমানতের খেয়ানত করে না এবং ওয়াদা রক্ষা করে তারাই প্রকৃত ইমানদার। এটি ইমানের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি। তাই যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই তার মধ্যে ইমান থাকে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهٗ

অর্থ: 'যার মধ্যে আমানতদারি নেই, তার ইমানও নেই।' (মুসনাদে আহমদ)

আমানত রক্ষা করা যেমন মুমিনের বৈশিষ্ট্য, তেমনি আমানত খেয়ানত করা মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। মহানবি (সা.) মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা দিয়ে বলেন,

اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

অর্থ: 'মুনাফিকের আলামত বা বৈশিষ্ট্য তিনটি–

১. যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে;

২. যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে এবং

৩. যখন তার কাছে কিছু আমানত রাখা হয়, তখন সে তা খেয়ানত করে।' (বুখারি ও মুসলিম)

আমানত রক্ষাকারী ব্যক্তি হাশরের ময়দানে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হবেন। তাই পরকালে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ও সাফল্য লাভ করতে হলে আল্লাহ তা'আলার দেওয়া আমানতের হেফাজত করতে হবে।

কেউ প্রকৃত ইমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তার মধ্যে আমানতদারিতা থাকে। তাই প্রকৃত মুমিনের দায়িত্ব হচ্ছে, কিছুতেই আমানতের খেয়ানত না করা। এমনকি খেয়ানতকারীর আমানতও নষ্ট করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে; তার আমানত তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত খেয়ানত করেছে তার আমানতও খেয়ানত করো না।' (আবু দাউদ)। অতএব কোনো কারণেই আমানতের খেয়ানত করা যাবে না।

মহানবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর আমানতদারিতা

মহানবি (সা.) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আমানতদার। তাঁর কাছে শুধু মুসলমান নয়; মক্কার কাফির, মুশরিকসহ অন্যান্য ধর্মের লোকেরা তাদের মূল্যবান ধনসম্পদ আমানত রাখত। তিনি মানুষের কাছে এতটাই বিশ্বাসী ছিলেন যে, তারা তাঁর কাছে টাকা-পয়সা এমনকি স্বর্ণালংকার ও নামিদামি জিনিসপত্র আমানত রেখে যেতে শঙ্কাবোধ করত না। তারা যেভাবে রেখে যেত, ঠিক সেভাবেই তিনি তাদের আমানত ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর চরম শত্রুও তাঁর কাছে আমানত রাখতে দ্বিধা করত না। তাঁর এ আমানতদারিতার জন্য মক্কাবাসী তাঁকে আল-আমিন বা পরম বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত করেন।

নবুয়তের পরে মক্কার কাফির-মুশরিকরা যখন তাঁকে চরম নির্যাতন করতে থাকে, এমনকি তাঁকে হত্যার পরিকল্পনাও করে। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যে রাতে নবিজি মদিনার পথে হিজরত করেছিলেন, সে রাতেও নিজের কাছে রাখা তাদের সংরক্ষিত আমানত তিনি হযরত আলী (রা.)-এর কাছে রেখে গিয়েছিলেন। যাতে তিনি প্রাপ্য ব্যক্তিদের কাছে তাদের আমানত যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে পারেন। (সুনানুল কুবরা-বায়হাকি) আমানতদারিতা একটি মহৎ গুণ। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমানত রক্ষায় সচেষ্ট থাকব। কারও কোনো আমানতের খেয়ানত করব না।

শিষ্টাচার

শিষ্টাচার মনুষ্যত্ববোধের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে সব গুণ মানব চরিত্রকে সুন্দর, আকর্ষণীয় ও গৌরবান্বিত করে তোলে তার মধ্যে শিষ্টাচার অন্যতম। এটি মানব চরিত্রের উন্নয়ন ঘটায় এবং ব্যক্তিকে সমাজে সম্মানিত করে।

শিষ্টাচার (اَلْاَدَبُ)-এর অর্থ

শিষ্টাচার শব্দটি শিষ্ট ও আচার শব্দদ্বয়ের সমন্বিত রূপ। সাধারণত শিষ্ট অর্থ-শান্ত, ভদ্র, সুশীল, সুবোধ, বিনয়ী, মার্জিত, নীতিবান। আর আচার অর্থ ব্যবহার, আচার-ব্যবহার, চালচলন, প্রথা ইত্যাদি। অতএব শিষ্টাচার অর্থ ভদ্র ব্যবহার ও নম্র আচরণ। মানুষের কথাবার্তা, চাল-চলন ও আচার-আচরণে যে ভদ্রভাব, সৌজন্য ও শালীনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তা-ই শিষ্টাচার বা আদব।

শিষ্টাচারের গুরুত্ব

শিষ্টাচার মানব চরিত্রের একটি মহৎ গুণ ও সৌন্দর্যের প্রতীক। সাধারণত শিষ্টাচারের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। এটি সম্প্রীতি ও সৌহার্দের চাবিকাঠি। এর বিপরীতে অশোভন ও অশালীন আচার-ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ সমাজের বিপর্যয় ডেকে আনে। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে ও নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায়। তাই সমাজকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ রাখতে শিষ্টাচারের প্রয়োজনীয়তা অনেক।

মানুষের কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ হওয়া উচিত মার্জিত, রুচিসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ। কথা ও কাজে যেন কারো প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রকাশ না পায় এবং নিজের গর্ব প্রকাশিত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন, 'অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না।'(সূরা লোকমান, আয়াত: ১৮)

মহানবি (সা.)-এর শিষ্টাচার

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন শিষ্টাচারের অনুপম আদর্শ। বহু কাফির, মুশরিক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শিষ্টাচার, সুন্দর ব্যবহার ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। একটি ঘটনা থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মহানুভবতা ও অনন্য শিষ্টাচারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ঘটনাটি ছিল এমন- একবার এক আরব বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে শাসন করার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে বললেন, তাকে প্রস্রাব করতে দাও এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ

তোমাদেরকে নম্র ব্যবহারকারী হিসাবে পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারকারী হিসেবে নয়। (বুখারি ও মুসলিম) প্রস্রাব শেষ করার পরে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বললেন, তখন সে বুঝতে পারল এটা তার ভুল ছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অভূতপূর্ব শিষ্টাচারে বেদুঈন ব্যক্তি এতটাই বিমুগ্ধ হলো যে, সঙ্গে সঙ্গে সে ইসলাম গ্রহণ করল।

রাসুলুল্লাহ (সা.) মিষ্টভাষী ছিলেন। সব সময় হাসিমুখে থাকতেন এবং মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন। কদর্যতা কিংবা রূঢ়তা তাঁর ভাষায় ছিল না। তিনি কখনও মুখ কালো করে থাকতেন না। ইবনে হারেস (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) অপেক্ষা অধিক মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি। (মুসনাদে আহমদ)

তিনি ছোটদের আদর করতেন এবং বড়দের সম্মান করতেন। সাক্ষাতে ছোট-বড় সবাইকে সালাম দিতেন, তাদের খোঁজখবর নিতেন। আনাস (রা.) বলেন, একদা আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন রাসুললুল্লাহ (সা.) কয়েকটি শিশুকে অতিক্রম করছিলেন এবং তাদেরকে সালাম করলেন। (মুসলিম)

আমরা কথাবার্তা ও আচার-আচরণে সংযত হবে, উত্তম ভাষায় মার্জিত ভঙ্গিতে কথা বলব। অহেতুক মিথ্যাচার, অপবাদ, দোষারোপ করা থেকে দূরে থাকব। সর্বোপরি কথাবার্তা, কাজকর্ম ও আচার-আচরণে শিষ্টাচার বজায় রাখব।

নিজের কাজ নিজে করার গুরুত্ব

আমরা দৈনন্দিন জীবনে যা করি, তা-ই কাজ। সাধারণত দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজ আমরা নিজেরাই করে থাকি। পৃথিবীর সকল মহামানব, নবি, রাসুল ও বিখ্যাত মনীষী নিজেদের কাজ নিজেরাই করতেন। অন্যরা করে দিতে চাইলেও তাঁরা তা করতে দিতেন না। নিজের কাজ নিজে করলে পছন্দমতো কাজ করা যায়, সময় বাঁচে, অর্থের সাশ্রয় হয় এবং কাজ সুন্দর হয়। নিজের কাজ অন্যে করলে সে কাজের গুরুত্ব কমে যায়। তা ছাড়া কাজ করলে শরীর ও মন দু'টিই ভালো থাকে। আর শরীর ও মন ভালো থাকলে লেখাপড়ায় মন বসে। প্রত্যহ নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে আরও অনেক সুবিধা পাওয়া যায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে কাজ করার শক্তি ও যোগ্যতা হলো মহান আল্লাহর এক পবিত্র আমানত। মানুষ কাজ করার এ শক্তিকে ব্যবহার করে নিজের ও সমাজের উন্নয়ন ও পরিবর্তন ঘটায়। কাজই মানুষের সফলতার মূল চাবিকাঠি। যারা চেষ্টা-সাধনা ও কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সফলতার পথ সুগম করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে।' (সূরা রা'দ, আয়াত: ১১)

জীবিকা নির্বাহের জন্য বৈধ কাজ করা একটি ইবাদাত। মহানবি (সা.) বলেন,

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ

অর্থ: 'ফরয ইবাদতের পর হালাল রুজি উপার্জন করা একটি ফরয ইবাদাত।' (বায়হাকি)

মহানবি (সা.) আরও বলেন,

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهٖ

অর্থ: 'কোনো ব্যক্তি নিজ হাতে উপার্জিত সম্পদের চাইতে উত্তম কিছু খাদ্য হিসেবে কখনও খায় না।' (বুখারি)

ইসলামে শ্রম ও শ্রম বিনিয়োগকারীর গুরুত্ব অনেক বেশি। রাসুলুল্লাহ (সা.) শ্রমিকের মজুরি কাজের সাথে সাথে আদায় করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মহানবি (সা.) বলেন, মজুরের শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি আদায় করে দেবে। (বায়হাকি) শ্রমজীবীর মর্যাদা সম্পর্কে মহানবি (সা.) আরও বলেন,

اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ

অর্থ: 'শ্রমজীবী আল্লাহর বন্ধু।' (বায়হাকি)

মহানবি (সা.) ও অন্য নবিগণ কর্তৃক নিজের কাজ নিজে করার দৃষ্টান্ত

মহামানবগণ নিজেদের কাজ নিজেরা করতে ভালোবাসতেন। আমাদের প্রিয়নবি (সা.) সর্বদা নিজের কাজ নিজে করতেন; এতে কোনো ধরনের লজ্জাবোধ করতেন না। তিনি কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন। ছোটবেলায় তিনি পশু চরাতেন; বড় হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। নিজেই বকরির দুধ দোহন করতেন, নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন, নিজের কাপড়-চোপড় নিজেই ধুয়ে নিতেন। ইসলামের জন্য বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিতেন; খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। হাদিসে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নবি-রাসুলই বকরি চরিয়েছেন। এমনকি রাসুলুল্লাহ (সা.) ও কতিপয় মুদ্রার বিনিময়ে মক্কাবাসীর বকরি চরাতেন। (বুখারি)। ইবনে হিশাম উল্লেখ করেছেন যে, তরুণ বয়সে রাসুলুল্লাহ (সা.) বনি সাদ গোত্রের বকরি চরাতেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

রাসুলুল্লাহ (সা.) গৃহস্থালি কাজেও স্ত্রীদের সাহায্য করতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) কি ঘরের কাজকর্ম করতেন? তিনি জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর নিজের জুতা নিজে সেলাই করতেন, পট্টি লাগাতেন। নিজের কাপড় সেলাই করতেন। তোমাদের কেউ যেমন নিজের ঘরে কাজ করে, তেমনি তিনি নিজের ঘরে কাজ করতেন।' (মুসনাদে আহমদ)

পৃথিবীতে নবি-রাসুলগণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও মর্যাদাপ্রাপ্ত ছিলেন। তারপরেও তাঁরা সকলেই নিজেদের কাজ নিজেরা করতেন। পরিশ্রম করে উপার্জন করতেন। মুসতাদরাক আল-হাকিম গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত দাউদ (আ.) যুদ্ধের পোশাক, লোহার অস্ত্র ও তৈজসপত্র প্রস্তুতকারী ছিলেন। হযরত আদম (আ.) দরজি, মূসা (আ.) কৃষক, নূহ (আ.) ছুতার এবং ইদ্রীস (আ.) দরজি ছিলেন। সুতরাং কোনো কাজকে তুচ্ছ করা যাবে না। শ্রমিককে সম্মান করতে হবে, তাকে অবহেলা বা ছোট করে দেখা যাবে না।

আমরা সবাই নিজেদের কাজ নিজেরা করব। ঘরের কাজে বাবা-মাকে সাহায্য করব। আমাদের জামা-কাপড় পরিষ্কার করা, পড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখা ইত্যাদি সকল কাজই নিজেরা করব। এর মাধ্যমে আমরা সুস্থ-সবল, কর্মঠ, আত্মবিশ্বাসী ও প্রত্যয়ী হব।

পরোপকার

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে কেউ একা চলতে পারে না। সমাজের প্রত্যেক মানুষ একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল। সমাজে বসবাসরত প্রত্যেক মানুষ পরষ্পরের সাথে মিলেমিশে বসবাস করে। সুখ-দুঃখ পরস্পর ভাগ করে নেয়। মানবিকতার দাবিতে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হয়। এভাবে একে অন্যের প্রয়োজনে বা উপকারে আসার নামই পরোপকার।

পরোপকারকে আরবিতে ইহসান (اَلْاِحْسَانُ) বলা হয়। এটি হুসনুন (حُسْنٌ) মূলধাতু থেকে নির্গত। হুসনুন শব্দের অর্থ সুন্দর বা সৌন্দর্য। সুন্দর ব্যবহার করা, উপকার করা, কষ্ট লাঘব করা, কোনো কাজ সুন্দরভাবে এবং উত্তমরূপে সম্পন্ন করার নাম ইহসান। মোটকথা, সৃষ্টির প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করাকে ইসলামের পরিভাষায় ইহসান বা পরোপকার বলা হয়।

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইহসান বা পরোপকার মহান আল্লাহর একটি গুণ। তাই সৃষ্টির সেরা মানুষের মধ্যে তিনি এ গুণটির বিকাশ দেখতে পছন্দ করেন। পরোপকার মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি। মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধা দেবে।'(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১১০)

পরোপকার মানব চরিত্রের অমূল্য সম্পদ। এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। পরোপকারী লোকদের আল্লাহ অধিক ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَ اَحۡسِنُوۡا ۚۛ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ○

অর্থ: 'আর তোমরা সৎকাজ ও পরোপকার করো, নিশ্চয় আল্লাহ সৎ কর্মপরায়ণ ও পরোপকারী লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৯৫)

আল্লাহ আরও বলেন,

وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الۡمُحۡسِنِیۡنَ ○ۤ

অর্থ: 'অবশ্যই আল্লাহ ইহসানকারী তথা পরোপকারীদের সাথে থাকেন।' (সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৬৯)

পরোপকার দ্বারা কেবল অন্যেরই কল্যাণ হয় তা নয়; বরং পরোপকারে নিজেরও কল্যাণ সাধিত হয়। কারণ, পরোপকার করলে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। যাদের উপকার করা হয় তারা কৃতজ্ঞ হয়। তার কোনো ক্ষতি করে না। ফলে তার জীবন নিরাপদ ও শান্তিময় হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

اِنۡ اَحۡسَنۡتُمۡ اَحۡسَنۡتُمۡ لِاَنۡفُسِکُمۡ ۟ وَ اِنۡ اَسَاۡتُمۡ فَلَهَا ؕ

অর্থ: 'তোমরা যদি অন্যের উপকার করো, তাহলে তা নিজেদেরই জন্য করলে, আর যদি অপকার করো, তাহলে তাও করবে নিজেদেরই জন্য।' (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৭)

ইহসান তথা পরোপকারের দ্বারা সহজে মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। চরম শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়। সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা হয়।

পরোপকার মানুষকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব মহামনীষী স্মরণীয় হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন পরহিতৈষী। আমাদের মহানবি (সা.) ছিলেন পরোপকারের মূর্ত প্রতীক। তিনি নিজে সব সময় মানুষের উপকার করতেন। অন্যকেও উপদেশ দিতেন মানুষের উপকার করতে। তিনি বলেন, 'তোমরা দুনিয়ার অধিবাসীদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহও তোমাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ করবেন।' (তিরমিযি)

মহানবি (সা.) আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো মুমিনের একটি সমস্যার সমাধান করবে, আল্লাহ আখেরাতে তার বিপদ থেকে একটি বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করবে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন। আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।' (মুসলিম)

সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। ধনী-গরিব, ছোট-বড়, আত্মীয়-আত্মীয়, মুসলিম-অমুসলিম, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের কল্যাণ করা, উপকার করা আমাদের কর্তব্য। আমরা সকল সৃষ্টির প্রতি যথাযথ কর্তব্য পালন করব। বিপদে এগিয়ে আসব। অন্যের উপকার করব। তাহলেই আল্লাহ আমাদের কল্যাণ করবেন।

দলগত কাজ:
শিক্ষার্থীরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পরোপকারের সুফল আলোচনা করবে।

সৃষ্টির সেবা

সৃষ্টির সেবা করা একটি মহৎ গুণ। ইসলামি পরিভাষায় সৃষ্টির সেবাকে খিদমাতুল খালক (خِدْمَةُ الْخَلْقِ) বলা হয়। আরবি খিদমত শব্দের অর্থ সেবা করা আর খালক শব্দের অর্থ সৃষ্টি। সুতরাং খিদমতে খালক অর্থ সৃষ্টির সেবা করা। মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া ও সহানুভূতিশীল হয়ে সেবা-যত্ন, লালন-পালন, সংরক্ষণ ও সহায়তা করাকে খিদমতে খালক বা সৃষ্টির সেবা বলে।

মানুষ যেমন মহান আল্লাহর সৃষ্টি, তেমনি পশু-পাখি, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, আলো-বাতাস, জড় ও অচেতন পদার্থ সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ইবাদাতের জন্য আর অন্যসব কিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর সেরা সৃষ্টি মানুষের কল্যাণের জন্য। তাই অন্যান্য সৃষ্টির কল্যাণ ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা মানুষের একান্ত কর্তব্য।

গুরুত্ব

সৃষ্টির সেবা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। সৃষ্টির সেবা করলে বা সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করলে মহান আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হন। তিনি তাদের দয়া করেন, অনুগ্রহ দান করেন। মহানবি (সা.) বলেন,

اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

অর্থ: 'তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' (তিরমিযি)

সৃষ্টিকুলকে যে ভালোবাসে, আদর-যত্ন করে মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকুলের প্রতি ভালোবাসার উপরই আল্লাহর ভালোবাসা নির্ভর করে। কারণ, সমগ্র সৃষ্টিই মহান আল্লাহর পরিজন। জিন-ইনসান, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ এ সব নিয়ে মহান আল্লাহর এক বিশাল সৃষ্টি পরিবার। এসব সৃষ্টির লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করা মানুষের কর্তব্য। এতে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন ও তার প্রিয়ভাজন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করা যায়। আর এ-সব সৃষ্টির প্রতি রূঢ় আচরণ ও দায়িত্ব পালন না করলে তিনি অখুশি হন। তাঁর ভালোবাসা থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন,

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ

অর্থ: 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন। আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তিই প্রিয়, যে তার পরিজনের প্রতি বেশি অনুগ্রহশীল।' (বায়হাকি)

সৃষ্টির সেবা করার মাধ্যমেই যেমনি পরকালীন মুক্তি ও শান্তি লাভ করা সম্ভব তেমনি এর ওপরই মহান আল্লাহর অনুগ্রহ নির্ভর করে। মহানবি (সা.) বলেন,

لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

অর্থ: 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেন না।' (বুখারি)

আমাদের সমাজের অসহায়, দরিদ্র, দুস্থ, অসুস্থ, রুগ্‌ণ ও আশ্রয়হীন অনেক মানুষ আছে। আমাদের দায়িত্ব অসহায়, দরিদ্র ও দুস্থদের সাহায্য-সহায়তা করা। অসুস্থ ও রুগ্‌ণদের সেবা-শুশ্রূষা করা, তাদের ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা। আশ্রয়হীনদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এসব দায়িত্ব পালন করব ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (সা.) বলেন,

وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ

অর্থ: 'বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার বান্দার সাহায্যে রত থাকেন।' (মুসলিম)

সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া করলে মহান আল্লাহ যে কত খুশি হন তা নিচের হাদিসটি দ্বারা বোঝা যায়। মহানবি (সা.) বলেছেন, হযরত মূসা (আ.) এর সময়ে একজন পাপী মহিলা ছিল। সে সব সময়ই পাপের কাজে লিপ্ত থাকত। কখনও কোনো ভালো কাজ করত না। একদিন দুপুর বেলা মহিলাটি একটি কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কূপের পাশে একটি পিপাসার্ত কুকুর পিপাসায় ছটফট করছিল। কুকুরটিকে দেখে মহিলার খুব মায়া হলো। সে তার পায়ের মোজা খুলে ফেলল। তারপর সেটি কূপের পানিতে ভিজিয়ে পানি নিয়ে কুকুরটিকে পান করাল। কুকুরের পিপাসা মিটে গেল। মহিলার এই কাজটি আল্লাহ তা'আলা খুব পছন্দ করলেন এবং তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। (বুখারি)

মানুষ ছাড়া অন্যান্য সৃষ্টির প্রতিও মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কুকুর-বিড়াল, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি প্রাণীর আমাদের মতো ক্ষুধা ও পিপাসা আছে। তাদের প্রতি আমাদের সদয় আচরণ করতে হবে। খাদ্য ও পানীয়র ব্যবস্থা করতে হবে। কোনোভাবেই এগুলোকে কষ্ট দেওয়া যাবে না।

এগুলোকে কষ্ট দিলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। পশু-পাখিকে কষ্ট দেওয়া মারাত্মক পাপের কাজ। হাদিসে আছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, একজন মহিলা একটি বিড়ালকে আটকে রেখেছিল। এমনকি সে বিড়ালটিকে ছেড়েও রাখেনি যে সে পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকবে। খাবার না পেয়ে একদিন বিড়ালটি মারা গেল। রাসুল (সা.) বললেন, এই বিড়ালের কারণে মহিলাটি জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

আমাদের পরিবেশে জীব-জন্তুর সাথে গাছ-পালা, লতা-পাতা, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, আগুন-পানি ও বায়ু বিদ্যমান। এগুলোর দ্বারা মহান আল্লাহ আমাদের জন্য পরিবেশকে ভারসাম্যপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। জীবজন্তুর সাথে সাথে এগুলোর প্রতিও আমাদের সদয় আচরণ করতে হবে। মহানবি (সা.) যেমন বৃক্ষরোপণ ও ফসল উৎপাদনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি তা সংরক্ষণের প্রতিও তাগিদ করেছেন। অকারণে গাছ কাটা যাবে না। মহানবি (সা.) যুদ্ধাবস্থায়ও বৃক্ষ নিধন ও ফসল বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।

মোটকথা ইসলাম মানুষের সেবা ও খেদমতের জন্য, সমাজের উপকারের জন্য নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহর সকল সৃষ্টির সেবাদানের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। আমরা সৃষ্টির সেবা করব। সৃষ্টিকুলের প্রতি সদয় আচরণ করব। কোনো জীবজন্তুকে কষ্ট দেব না। পরিবেশ সংরক্ষণে যত্নবান হব।

আখলাকে যামিমাহ (নিন্দনীয় চরিত্র)

আখলাকে যামিমাহ অর্থ নিন্দনীয় চরিত্র বা মন্দ চরিত্র। মানুষের চরিত্রের খারাপ ও বর্জনীয় দিকগুলোই হলো আখলাকে যামিমাহ। মিথ্যাচার, প্রতারণা, ক্রোধ, লোভ লালসা, পরনিন্দা, মানুষকে কষ্ট দেয়া প্রভৃতি আখলাকে যামিমাহ-এর উদাহরণ। প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আমরা মানুষের নিন্দনীয় চরিত্র বা বর্জনীয় আচরণসমূহ সম্পর্কে জেনে নিই।

মানুষকে কষ্ট দেওয়া

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আল কুরআনের ভাষায় মহান আল্লাহ তা'আলা বনী আদম তথা সকল মানুষকে সম্মানিত করেছেন। তাই কোনো মানুষকে অসম্মান করা মূলত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। এই অপরাধ দুইভাবে হয়ে থাকে।

১. কথার মাধ্যমে
২. কাজের মাধ্যমে

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পীড়া দেয়, এমন কোনো অপরাধের জন্য যা তারা করেনি; তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।' (সূরা আহযাব' আয়াত: ৫৮) আমরা যদি আমাদের সমাজব্যবস্থার দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব মানুষ প্রতিনিয়ত ইচ্ছা-অনিচ্ছায়

এ-জাতীয় পাপের সাথে জড়িত হচ্ছে। কথার মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বলতে বোঝায় কাউকে গালি দেওয়া, গিবত তথা পরনিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া, ব্যঙ্গ করা, খোঁটা দেওয়া ইত্যাদি।

কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া বলতে বোঝায় প্রতারণা, জুলুম, রাস্তা বন্ধ করা, দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান, সম্পদ জবরদখল, শত্রুতা পোষণ, হত্যা করা, লেখনী ও ফেসবুকে অসম্মানজনক কথা লেখা ইত্যাদি।

এসব কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে মূলত কষ্ট দেওয়া হয়। অথচ মহানবি (সা.) বলেছেন, 'মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি যার জিহবা ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকে।' (বুখারি) তাই প্রকৃত মুসলমান হতে হলে অপর মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া মানুষের কষ্ট দূর করাকে হাদিসে ইমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'ইমানের সত্তরের বেশি শাখা প্রশাখা আছে। তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা আর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা।' (ইবনে মাজাহ)

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দেখলে সরিয়ে ফেলতে হবে। না হলে নানা রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন কেউ রাস্তায় কলার খোসা ফেলে রাখলে তা আমরা সরিয়ে রাখব। না হলে পথচারী পা পিছলে পড়ে যেতে পারে। তাই কাউকে আমরা কষ্ট দেবো না। আল্লাহ বলেছেন, 'যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তওবা করে নি তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহনযন্ত্রণা।' (সূরা বুরুজ, আয়াত: ১০)

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সারাবিশ্বে অবাধ তথ্যপ্রবাহ হচ্ছে। যেকোনো খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা বিশ্বে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ব্যবহার করে গুজব বা বিভিন্ন ভুল তথ্য প্রচার করে মানুষের মান সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে যা ইসলামি চিন্তা-চেতনার বিরোধী। কেননা, মহানবি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেবে না, তাদেরকে লজ্জাও দেবে না এবং তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবে না।' (তিরমিযি)

যারা মানুষকে কষ্ট দেয়, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই পার্থিব জীবনে তাদের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না। ফলে তাদের দুঃসময়ে কেউ পাশে দাঁড়ায় না। আখিরাতে তারা আমলশূন্য হয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, যদিও তারা এই পৃথিবীতে অনেক ভালো কাজ করে। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের উপর জুলুম করে, সে যেন তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় তার ভাইয়ের পক্ষে তার নিকট হতে পুণ্য কেটে নেওয়ার আগেই। কারণ, সেখানে কোনো দিনার বা দিরহাম নেই। তার কাছে যদি পুণ্য না থাকে তাহলে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপ এনে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।'

অতএব প্রাত্যহিক জীবনে আমরা মিলেমিশে বসবাস করব। কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকব।

অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানো

বর্তমান সমাজে অপপ্রচার ও গুজবের ভয়াবহতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। অপপ্রচার ও গুজবের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে গুজব ছড়ানোর সবচেয়ে আলোচিত মাধ্যম হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে গুজব দ্রুত দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাজারে দ্রব্য মূল্যের দাম বৃদ্ধির অস্থিরতা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অস্থিরতার মতো চরম অনাকাঙ্ক্ষিত গুজবও সৃষ্টি করা হচ্ছে।

গুজব রটানো ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ কাজ। কারণ, কোনো বিষয়ের সঠিক জ্ঞান না থাকলে তা প্রচার করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ
تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ○

অর্থ: 'হে মুমিনগণ! যদি কোনো অবিশ্বস্ত লোক তোমাদের নিকট কোনো বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসো এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।' (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ০৬)

এই আয়াত থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখতে পারি। কোনো বিষয় আমাদের সামনে এলে সাথে সাথে তা প্রচার না করে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে ও বুঝে প্রচার করা নৈতিক দায়িত্ব। সচেতন মানুষের এই দায়িত্বশীলতার দরুন অন্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

কোনো তথ্যের সত্যতা যাচাই না করে প্রচার করার ফলে নিজের ব্যক্তিত্ব ও সম্মান নষ্ট হয়ে যায়। সমাজে সবাই অবিশ্বাস করতে থাকে। হাদিসে এসেছে,

كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

অর্থ: 'কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে কোনো কথা শোনামাত্রই (যাচাই না করে) বলে বেড়ায়।' (আবু দাউদ)

কাজ: অপপ্রচার ও গুজব ছড়ানোর পরিণতি কী হতে পারে তা জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করো।

খাদ্যে ভেজাল মেশানো

ভেজাল হচ্ছে নৈতিকতা ও মানবতাবিরোধী ঘৃণ্য এক অপরাধের নাম। কোনো সুস্থ মানুষ এ ধরনের অপরাধ করতে পারে না। আমাদের সমাজে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ও মুনাফালোভী মানুষ রয়েছে যারা অধিক লাভের আশায় খাদ্যে ভেজাল দিয়ে থাকে। শুধু খাদ্যে নয় নানা দ্রব্যে এখন ভেজাল ও অসাধু পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর ফলে মানুষ মরণব্যাধি ক্যানসারেও আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ইসলাম এ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে, হযরত ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَّنَهُ صَاحِبُهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَإِذَا طَعَامٌ رَدِيْءٌ فَقَالَ بِعْ هٰذَا عَلٰى حِدَةٍ وَهٰذَا عَلٰى حِدَةٍ۔ فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ: 'রাসুলুল্লাহ (সা.) একদিন এক স্তূপ খাদ্যসামগ্রীর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। যার মালিক একে খুব পরিপাটি করে সাজিয়ে রেখেছিল এবং এর প্রশংসা করছিল। তিনি এতে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। দেখা গেল যে, এর ভিতরে নিম্নমানের খাদ্যও রয়েছে। তিনি তখন বললেন, এটি পৃথকভাবে বিক্রি করো। কেননা, যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'(আহমাদ)

কাজ ১: শিক্ষকের নেতৃত্বে দলগতভাবে সবাই মিলে খাদ্যে ভেজাল মেশানো-সংক্রান্ত ইসলামের নির্দেশনাগুলো ব্যবসায়ীদের অবগতকরণ সংক্রান্ত চর্চা।

কাজ ২: ছোট ছোট কিউ কার্ডের মাধ্যমে ভেজাল মেশানোর নেতিবাচক দিক লিখন ও তা সবাইকে বিতরণ।

অহংকার

অহংকার-এর বাংলা প্রতিশব্দ অহমিকা, বড়াই, গর্ব, দম্ভ, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি। এর আরবি প্রতিশব্দ আল-কিবর (اَلْكِبْرُ)– যার অর্থ বড়ত্ব, নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা। পরিভাষায় অহংকার হলো- অন্য কোনো মানুষ থেকে কোনো দিক থেকে নিজেকে বড়, উত্তম বা উন্নত মনে করা অথবা কাউকে কোনোভাবে নিজের চেয়ে হেয় মনে করা। হাদিসের ভাষায়,

اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

অর্থ: 'অহংকার হলো সত্যকে দম্ভের সাথে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।' (মুসলিম)

অহংকারের পরিণতি

মানব চরিত্রের নিন্দনীয় দিকসমূহের মাঝে অহংকার একটি অত্যন্ত জঘন্য দিক। এটি সর্বাধিক নিন্দনীয় স্বভাব। এটি মানব স্বভাবে লুকিয়ে থাকা ছয়টি রিপুর মাঝে একটি। অহংকার একটি নিন্দনীয় মানসিক অনুভূতি। তবে কথা, কাজ ও চাল-চলনের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এটি একটি মারাত্মক পাপ এবং এটি কুফরিসহ আরও অনেক পাপের মূল উৎস। বলা হয়, অহংকার হচ্ছে এ জগতের প্রথম পাপ। ইহকাল ও পরকালে অহংকারের অনিষ্টতা ভয়াবহ। তাই একে পরিহার করা অত্যাবশ্যক।

অহংকারীকে যেমন আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন না তেমনি মানুষও তাকে পছন্দ করে না। আল-কুরআনে মহান আল্লাহ অহংকারীদের অপছন্দ করার কথা বারবার জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۙ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা দাম্ভিক, অহংকারী।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬)

অহংকার করে অতীতে বহু জাতি-গোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে গেছে। আল-কুরআনে বর্ণিত আদ, সামুদ, ইরাম এবং অন্য অমিত শক্তিধর ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী জাতিসমূহের ধ্বংসের অন্যতম কারণ ছিল অহংকার আর সীমালঙ্ঘন। ফিরাউন এবং নমরুদও অহংকার আর বাড়াবাড়ি করেই ধ্বংস হয়েছে। অহংকার মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে দেয়। অহংকারের কারণেই ইবলিস অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তানে পরিণত হয়েছিল। তাই অহংকার পতনের মূল।

অহংকার আগুন সদৃশ যা মানুষের অন্যান্য সৎ গুণকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়। মানব চরিত্রে অহংকার প্রবল হলে তখন তার হিতাহিত জ্ঞান হ্রাস পায় এবং তার সুস্থ-স্বাভাবিক বিবেক ও বোধশক্তি লোপ পায়। ফলে সে নিজের চাল-চলন, কথাবার্তা, আচার-আচরণ সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যা খুশি তা-ই করতে শুরু করে। পরিণতিতে দুনিয়াতে সে পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে থাকে। মানুষ তাকে ঘৃণা করে এবং তার থেকে দূরে চলে যায়।

অহংকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না বরং তাদের জন্য এ জীবনে রয়েছে মর্মন্তুদ ও অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'হাশরের ময়দানে অহংকারী লোকগুলো পিঁপড়ার মতো করে জড়ো হবে। অপমান তাদের চারদিক হতে ঘিরে ধরবে। তাদেরকে জাহান্নামের এমন একটি স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে যার নাম বা'লাস, তার মধ্য থেকে সবচেয়ে উত্তপ্ত অগ্নিশিখা উঠবে এবং তাদেরকে জাহান্নামিদের পুঁজ রক্ত পান করতে দেওয়া হবে, যার নাম তিনাত আল খাবাল।'(তিরমিযি)

রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

অর্থ: 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে।' (মুসলিম)

মানুষের ধন-দৌলত,বিত্ত-বৈভব, সন্তান-সন্ততি, রূপ-সৌন্দর্য, জ্ঞান-গরিমা, শক্তি-সামর্থ্য–সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার দান। তাই অহংকার করার মতো মানুষের নিজের কিছুই নেই। অহংকার একমাত্র মহান আল্লাহর অধিকার। এ জন্য তাঁর এক নাম 'আল মুতাকাব্বির' বা আত্মঅহংকারী। অর্থাৎ মুতাকাব্বির বলা হয় সেই মহান সত্তাকে যাঁর জন্যই কেবল অহংকার, দর্প, গর্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব সুনির্দিষ্ট।

ইসলাম সব ধরনের অহংকার থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে অহংকার পরিহার করে বিনয়ী ও নম্র হওয়ার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনোই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না।' (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ৩৭)

আমরা সব ধরনের অহংকার পরিহার করে চলব। বিশেষত অহংকারবশে মানুষকে অবজ্ঞা করব না; উদ্ধতভাবে চলাফেরা করব না; বরং সংযতভাবে চলাফেরা করব এবং সবার সাথে নিচু স্বরে বিনম্র ভাষায় কথা বলব।

কাজ: যেসব আচরণ ও কাজের মাধ্যমে অহংকার প্রকাশ পায়, জোড়ায় কাজের মাধ্যমে তার একটি তালিকা তৈরি করে সেসব আচরণ ও কাজ থেকে মুক্ত থাকতে তোমার প্রতিশ্রুতিমূলক বক্তব্য বন্ধুদের সামনে তুলে ধরো।

হিংসা

হিংসা মানব চরিত্রের এক জঘন্যতম দিক। মানুষে মানুষে কলহের বীজ বপন করে এই হিংসা। প্রকৃতপক্ষে হিংসা অর্থ অন্যের উন্নতি ও কল্যাণ সহ্য করতে না পারা, অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা ইত্যাদি এটিকে পরশ্রীকাতরতাও বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় অপরের ভালো কিছু দেখে তা ধ্বংস কামনা করা ও নিজে এর অধিকারী হওয়ার বাসনা করা। আরবি ভাষায় হিংসা শব্দটি হাসাদ হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করবে না এবং পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। বরং সবাই আল্লাহর বান্দা, পরস্পর ভাইভাই হয়ে থাকবে।' (বুখারি ও মুসলিম)

নেতিবাচক প্রভাব: হিংসা একটি মানসিক রোগ। এই রোগ থেকে আরও অনেক রোগের উৎপত্তি হতে পারে। তাই বর্তমানে গবেষকরা শান্তিময় জীবন লাভের জন্য হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগের পরামর্শ দেন। আরবিতে একটি প্রবাদ আছে: اَلْحَاسِدُ يَحْتَرِقُ بِنَارِ الْحَسَدِ অর্থাৎ হিংসুক হিংসার আগুনে জ্বলে। তাই হিংসুকের জীবনে দুর্দশা নেমে আসে। ইসলামের আলোকে চিন্তা করলে হিংসুকের ইমানও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন মহানবি (সা.) বলেছেন, 'কোনো বান্দার কলবে (হৃদয়ে) ইমান ও হিংসা একসাথে থাকতে পারে না।' (নাসাঈ) সাধারণত আমরা অনেক কষ্ট করে সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করি। যদি আমরা মনে হিংসা লালন করি, তাহলে সৎকর্মসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং মহানবি (সা.) আমাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, 'তোমরা হিংসা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, আগুন যেমন লাকড়ি গ্রাস করে পুড়িয়ে দেয়, হিংসাও তেমনি মানুষের সৎকর্মসমূহকে গ্রাস করে বা নষ্ট করে দেয় (আবু দাউদ)। শুধু তাই নয় হিংসুক ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষমার রাতেও ক্ষমা করা হয় না। যেমন মহানবি (সা.) বলেছেন, শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতে (১৪ শাবান দিবাগত রাতে) বা শবে বরাতে মহান আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং সব বান্দাকে ক্ষমা করেন, শুধু শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি এবং

ঐ ব্যক্তি যে অন্য (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে তাকে ছাড়া।' (সিলসিলাতুল আহাদিস সাহিহ)।

হিংসা পরিত্যাগের সুফল: হিংসা পরিত্যাগ করলে জীবনের সমগ্র সুখ ও শান্তি বিরাজমান থাকে। জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে। দেশ ও জাতি সমৃদ্ধি অর্জন করে। আর একজন মুসলিমের চূড়ান্ত সফলতা হলো, আখিরাতের সফলতা। হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগের মাধ্যমে একজন মুমিন এই চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করতে সমর্থ হয়। প্রিয়নবি (সা.) একদা এক সাহাবিকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করেন। তিনি কী আমল করেন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি (জান্নাতি সাহাবি) উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা যাকে কোনো উত্তম বস্তু দান করেছেন, আমি তার প্রতি কখনই হিংসা পোষণ করি না। (ইবনে মাজাহ)

হিংসা পরিত্যাগের উপায়

১. প্রতিদিন মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করা; যেমন আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

অর্থ: 'আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই যখন সে হিংসা করে।' (সূরা আল-ফালাক, আয়াত: ৫)

২. বেশি বেশি সালামের প্রচলন ঘটানো। হাদিসের আলোকে সালামের প্রচলন হলে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। হিংসা কমে যাবে।

৩. সম্ভব হলে শরিয়তসম্মত হাদিয়া (উপহার) আদান-প্রদান করা। রাসুল (সা.) বলেছেন , 'তোমরা পরস্পর হাদিয়া দাও এতে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।'

ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে হিংসা সম্পূর্ণরূপে হারাম (নিষিদ্ধ)। অতএব, আমরা এই হিংসা থেকে বাঁচার চেষ্টা করব।

ক্রোধ

ক্রোধের শাব্দিক অর্থ রাগ। এটা একটি খুবই শক্তিশালী নেতিবাচক আবেগ। মানুষের আশাভঙ্গ, নিষ্ফলতা ও ব্যর্থতায় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হলো ক্রোধ। সাধারণত ঝগড়া, তিরস্কার ও অহংকারের ফলে ক্রোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। এই ক্রোধের ফলে জীবনে নেমে আসতে পারে চরম বিপর্যয়।

ক্রোধের অপকারিতা: মানুষের নিন্দনীয় চরিত্রের অন্যতম হলো ক্রোধ। ক্রোধের সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। তাই সে অসংযত হয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটায়। এ কথা সত্য যে রাগ জীবন থেকে কিছু না কিছু কেড়ে নেয়। ক্ষেত্র বিশেষে রাগ প্রদর্শন প্রয়োজন হয়। তবে এর অপব্যবহারে এমনকি এই ক্রোধ আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ইমানকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। যেমন মহানবি (সা.) বলেছেন, 'সিরকা মধুকে যেমন নষ্ট করে, ক্রোধও তেমনি ইমানকে নষ্ট করে।'(বায়হাকি)

একদা এক সাহাবি আমাদের প্রিয় মহানবি (সা.) কে বলেছেন, 'আপনি আমাকে ভালো কাজের উপদেশ দিন। তিনি বললেন, 'তুমি রাগ করো না'। এই ব্যক্তি তা (সাহাবি) কয়েকবার বললেন কিন্তু নবিজি (সা.) প্রতিবারই বললেন, রাগ করো না।' (বুখারি)

ক্রোধ সংবরণের উপকারিতা: মুমিন জীবনের সফলতা আখিরাতে মুক্তির মাধ্যমে অর্জিত হয়। যারা নিজেদের ক্রোধকে সংবরণ করতে পারে তাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদা হলো জান্নাত। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি, আকাশমন্ডল ও ভূ পৃষ্ঠের ন্যায়; যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৩৩-১৩৪)। এছাড়া ক্রোধ সংবরণ করা একটি সাহসিকতাপূর্ণ কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ

অর্থ: 'সে প্রকৃত বীর নয় যে কুস্তিযুদ্ধে খুব লড়তে পারে। বরং সেই প্রকৃত বীর যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে পারে।' (বুখারি ও মুসলিম) এক গবেষণায় দেখা গেছে যারা ক্রোধ লালন করে না তাদের শারীরিক রোগব্যাধি কম হয়।

ক্রোধ দমনের উপায়: পবিত্র হাদিসের আলোকে ক্রোধ দমনের উপায়গুলো নিম্নরূপ:

১. অযু করা। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। শয়তান হলো আগুনের তৈরি। আর আগুনকে ঠান্ডা করে পানি। যদি কারও ক্রোধ বা রাগ আসে তার উচিত অযু করে নেওয়া।' (বুখারি)

২. স্থান পরিবর্তন করা। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, 'যখন তোমাদের কারও রাগ আসে, তখন দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে বসে পড়বে। তাতেও যদি রাগ না কমে, তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে।'

৩. আউজুবিল্লাহ পড়া। মহানবি (সা.) রাগ কমানোর জন্য আউজুবিল্লাহ পড়ার উপদেশ দিতেন, যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

৪. চুপ থাকা। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'তোমরা শিক্ষা দাও এবং সহজ করো। দ্বীনের বিষয়ে কঠিন করো না। যখন রাগান্বিত হও তখন চুপ থাকো, যখন রাগান্বিত হও চুপ থাকো, যখন রাগান্বিত হও চুপ থাকো।' (মুসনাদ আহমদ)

অতএব আমরা ক্রোধের ভয়াবহতা উপলব্ধি করব। ক্রোধ বর্জন করে সুখে থাকব।

লোভ

মানুষের খারাপ অভ্যাসগুলোর মধ্যে লোভ অন্যতম। লোভ মানুষকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। একজন লোভী মানুষ সকল কিছুতেই লোভ করতে থাকে। সে কোনো কিছুতে তৃপ্ত হয় না। দুনিয়ার যে কোনো জিনিস পায় না কেননা সে আরও পেতে চায়। যার ফলে সে কোনোদিন সুখি হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ একজন মানুষের যদি একটি জামা থাকে, তাহলে সে আরও একটি জামা পেতে চায়। এভাবে একটি পাবার পরে সে

আরও পেতে চায়। একপর্যায়ে সে যখন অনেক জামার মালিক হয়ে যায় সে তখন আরও জামা পেতে চায়। সে কখনও শুকরিয়া আদায় করে না। এভাবে করে একজন মানুষ তার নৈতিকতা হারায়। মানবজীবনে এভাবে প্রতিটি কাজে মানুষ লোভ করতে থাকে। একজন মুমিন বান্দা কখনও লোভী হবে না। আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছেন তাতে সে শুকরিয়া আদায় করবে। একই সাথে চেষ্টা করে যাবে যাতে ভাগ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে। এর ফলে নিজের ভাগ্য উন্নয়ন হবে এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হবে। কেননা, মানব জীবন সংক্ষিপ্ত। মানুষের সংক্ষিপ্ত জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে ইহকাল ও পরকাল উভয়ই কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

লোভী ব্যক্তি নিজের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। তার কাছে যা আছে তাতে সে সুখি হয় না। সে অন্যায়ভাবে আরও পেতে চায়। অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অবৈধভাবে উপার্জনের দিকে হাত বাড়ায়। লোভ মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায় আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। সম্পদ ও উচ্চভিলাসী জীবন-যাপনের বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করে আল-কুরআনে নির্দেশনা এসেছে। কুরআন শরিফের সূরা তাকাসূরে মহান রাব্বুল আলামিন বলেন, ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।’ (সূরা তাকাসুর, আয়াত: ১-২)

লোভ ও লালসা করাকে ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা, এ জিনিসই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে এবং পরস্পর রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে উসকিয়ে দিয়েছে। লোভ-লালসার কারণেই তারা হারামকে হালাল সাব্যস্ত করেছে।’ (মুসলিম)

কাজ: লোভের নেতিবাচক দিকসমূহ নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় কথোপকথন।

এতক্ষণ আমরা বেশ কিছু আখলাকে হামিদাহ এবং আখলাকে যামিমাহ সম্পর্কে জানলাম। এবার তাহলে আখলাকে হামিদাহ অনুশীলন এবং আখলাকে যামিমাহ থেকে বিরত থাকার পালা। সপ্তম শ্রেণির আর যেটুকু সময় বাকি সেটুকু সময়ে তুমি শ্রেণিকক্ষে সহপাঠী বন্ধুদের সাথে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আখলাকে হামিদাহ এর চর্চা করবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণি থেকে যে যে আখলাকে হামিদাহ এর বিষয়ে পড়ে ও শিখে এসেছ, সেগুলো এবার বাস্তবে প্রয়োগ করবে। শিক্ষক এ বিষয়ে তোমাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

জীবনাদর্শ

প্রিয় শিক্ষার্থী, জীবনাদর্শ বলতে কি বোঝায় তা কি তুমি জানো? জীবনাদর্শ বলতে ইসলাম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে এমন কিছু ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যাঁদের জীবন আদর্শ জীবন এবং যাঁদের জীবন থেকে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে। তুমি কি এমন কোনো ব্যক্তির কথা চিন্তা করতে পারো যার জীবন থেকে তুমি ভালো কাজ, ভালো আচরণ এবং সুন্দর চারিত্রিক গুণাবলির শিক্ষা নিতে পারো? জীবনাদর্শ অধ্যায়ের পাঠে প্রবেশের আগে সহপাঠী বন্ধুদের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করে নাও। কিভাবে করবে তা শিক্ষক তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন।

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)

(নবুয়ত থেকে হিজরত পর্যন্ত)

প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম থেকে নবুয়ত পর্যন্ত জীবনচরিত সম্পর্কে জেনেছি। আজ নবুয়ত পরবর্তী প্রিয়নবি (সা.)-এর মক্কার কাফের-মুশরিকদের অত্যাচার-নির্যাতন উপেক্ষা করে ইসলাম প্রচার, আল্লাহর দিদার লাভে মিরাজ গমন এবং মদিনায় হিজরতসহ আরও অনেক বিষয় সম্পর্কে জানব।

গোপনে ইসলাম প্রচার

মহানবি (সা.) নবুয়ত লাভের কিছু দিন পরে আবার তাঁর প্রতি ওহি পাঠিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বললেন,

يَآ اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط

অর্থ: ‘হে রাসুল! আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা প্রচার করুন।’ (সূরা মায়িদা, আয়াত: ৬৭)

মহান আল্লাহর এ নির্দেশের পর মহানবি (সা.) আরববাসীকে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। প্রথমে তিন বছর তিনি তাঁর নিকট আত্মীয়-স্বজন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের নিকট গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। হযরত খাদিজা (রা) সর্বপ্রথম তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর বয়স্কদের মধ্যে তাঁর একান্ত সহচর আবু বকর (রা.), বালকদের মধ্যে হযরত আলী ও যায়েদ ইসলাম গ্রহণ করেন।

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

নবুয়তের তিন বছর পর প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রদানের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি মহান আল্লাহর নিকট থেকে ওহি আসলো। আল্লাহ বলেন,

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ ۙ

অর্থ: ‘আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।’ (সূরা শুআরা, আয়াত: ২১৪)

রাসুলুল্লাহ (সা.) মহান আল্লাহর এ নির্দেশনা পেয়ে মক্কাবাসীদের সাফা পাহাড়ের পাদদেশে জড়ো করে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরগণ! আমি যদি বলি, এ পাহাড়ের অপর দিকে শত্রুপক্ষ রয়েছে। তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করতে উদ্যত। তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা সকলে বলল, হ্যাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করব। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি আসন্ন কঠিন শাস্তির ব্যাপারে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তখন আবু লাহাব (আল্লাহ তার প্রতি লা‘নত বর্ষিত করুন) বলে উঠল, তুমি ধ্বংস হও। তুমি কি এজন্যই আমাদের এখানে ডেকেছিলে? আবু লাহাবের এ আচরণে রাসুল (সা.) অনেক কষ্ট পান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাসুল (সা.) কে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা সূরা লাহাব নাযিল করেন।

মুসলমানদের উপর কুরাইশদের নির্যাতন

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের পর থেকেই মক্কার কুরাইশরা মহানবি (সা.) ও তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন শুরু করে। ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করার জন্য তারা মুসলমানদেরকে বন্দী করে রাখা, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট দেওয়া, প্রহার করা, লৌহদণ্ড গরম করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে দাগ দেওয়া, প্রখর রৌদ্রে মরুভূমিতে চিৎ করে শুইয়ে পাথর চাপা দেওয়াসহ নানা প্রকারের অমানবিক নির্যাতন চালাতে থাকে। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া)। তাদের বর্বর নির্যাতনে হযরত আম্মারের মা সুমাইয়া (রা.) সর্বপ্রথম শহীদ হন। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে হযরত বেলাল (রা.)-এর মনিব তাঁকে অমানুষিক শাস্তি প্রদান করেন। তারা প্রিয়নবির পথে কাঁটা ছড়িয়ে রাখত, তাঁকে প্রস্তর মারত। কিন্তু তাদের অকথ্য অত্যাচারের পরেও তৌহিদের পথ থেকে কেউ বিচ্যুত হননি; তাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।

আবিসিনিয়ায় গমন

নবদীক্ষিত মুসলমানদের উপর অমানবিক নির্যাতন দেখে প্রিয়নবি (সা.)-এর প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি কুরাইশদের অমানবিক নির্যাতন থেকে পরিত্রাণের জন্য অসহায় নওমুসলিমদেরকে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। প্রথমে নবুয়তের পঞ্চম বছর রজব মাসে হযরত উসমান ও তাঁর স্ত্রী রাসুল (সা.)-এর কন্যা রুকাইয়াসহ ১১জন পুরুষ ও ৪জন মহিলা আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিছু দিন পর দ্বিতীয় ধাপে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ আরও ৮৩জন মুসলমান সেখানে আশ্রয় নেন। কুরাইশরা আমর ইবন আসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে আশ্রিত মুসলিমগণকে তাদের হাতে সমর্পণের অনুরোধ করে। কিন্তু বাদশাহ নাজ্জাসী মুসলমানদের কথায় মুগ্ধ হয়ে কুরাইশ প্রতিনিধি দলকে আবিসিনিয়া থেকে বের করে দেন।

কুরাইশদের বয়কট ও দুঃখের বছর

কাফির-মুশরিকদের নির্যাতন ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বনু হাশিম ও বনু আব্দুল মুত্তালিবের লোকজন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সহায়তায় এগিয়ে আসেন। এ ছাড়া ইতোমধ্যে মহানবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর চাচা হামযা (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করায় মুসলমানদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে উপয়ান্তর না পেয়ে কুরাইশরা মিলে মহানবি মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর অনুসারীদেরকে বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলো। তারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবার ও অনুসারীদের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করল। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে শিয়াবে আবু তালেব নামক নির্জন পার্বত্য উপত্যকায় আশ্রয় নিলেন। খাদ্য-পানীয় চরম সংকটসহ ভীষণ দুঃখ-কষ্টে তাঁদের দিন কাটে। এভাবে তিন বছর কঠোর অগ্নিপরীক্ষার পরেও তাঁরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস হারালেন না। অবশেষ তিন বছর পর কুরাইশরা তাদের শর্ত প্রত্যাহার করল।

কুরাইশদের থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নবুয়তের ১০ম বছরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয় স্ত্রী বিবি খাদিজা (রা.) ও অভিভাবক চাচা আবু তালেব দুজনেই ইন্তেকাল করেন। তাঁরা ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শক্তি ও সাহায্যকারী, সত্যিকারের বন্ধু ও পরামর্শদাতা, বিপদে আপদে রক্ষাকর্তা। তাদের অভাবে মহানবি (সা.) ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়েন। এ সুযোগে কাফেররা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। প্রিয়নবি (সা.)-এর একান্ত প্রিয়জনের মৃত্যু এবং এ ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের জন্য এ বছরকে আমুল হুযন বা দুঃখের বছর বলা হয়।

তায়েফ গমন

চাচা আবু তালেবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা মহানবি (সা.)- এর উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। শেষ পর্যন্ত তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তায়েফ গমন করলেন। কিন্তু তায়েফবাসী তাঁকে প্রস্তরাঘাতে রক্তরঞ্জিত করল। তারা জঘন্য অত্যাচার করে তাঁকে পাগল বলে শহর থেকে তাড়িয়ে দিল।

রাসুল (সা.)-এর মিরাজ

মিরাজ অর্থ উর্ধ্ব গমন, ইসরা অর্থ রাত্রিকালীন ভ্রমণ। পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাইল এর প্রারম্ভে এই ইসরা ও মিরাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। স্বজন হারানোর বেদনা ও কাফিরদের অব্যাহত নিষ্ঠুর আচরণের এই

দুঃসময়ে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিব (সা.) কে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে সৃষ্টির অপার রহস্য প্রদর্শন করেন এবং তাঁর দিদারে প্রিয় নবির মনকে আনন্দে ভরে দেন। এই পর্বটিকেই মিরাজ বলা হয়। মিরাজ রাসুল (সা.)-এর জীবনে অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রাসুল (সা.) নবুয়তের ১০ম বা ১১শ বছরে রজব মাসের ২৭ তারিখ গভীর রজনীতে বোরাক নামক বেহেশ্তি বাহনে চড়ে কাবাগৃহ হতে জেরুজালেমে বাইতুল মাকদাস এবং পরে সেখান থেকে উর্ধ্বালোকে গমন করে মহান আল্লাহর দিদার লাভ করেন। মিরাজের রজনীতেই প্রিয়নবি (সা.)-এর উম্মতদের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়।

আকাবার শপথ

নবুয়তের দ্বাদশ বছরে হজ্জের সময়ে ইয়াছরিব (মদিনার পূর্ব নাম) থেকে আগত ১২জনের একটি দল রাসুল (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা আকাবা উপত্যকায় মহানবি (সা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা এক আল্লাহর উপাসনা করা এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে দূরে থাকার শপথ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এই শপথকেই আকাবার প্রথম শপথ বলা হয়।

আকাবার প্রথম শপথের পরবর্তী বছরে ৬২২ খ্রি. মদিনা হতে ৭৫জনের একটি দল (৭৩জন পুরুষ ও ২জন মহিলা) এসে রাসুল (সা.) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁরা প্রিয়নবিকে তাঁদের দেশে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। এ ছাড়াও তাঁরা ইসলাম প্রচারে সর্বপ্রকার সাহায্য এবং ইসলামকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই আকাবার দ্বিতীয় শপথ। ইসলামের ইতিহাসে আকাবার শপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মদিনায় হিজরত

আকাবার শপথের পর মদিনায় ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। মদিনার মনোরম প্রকৃতি ও ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশের জন্য মহানবি (সা.) সেখানে হিজরতের জন্য মনস্থির করেন। এদিকে মক্কার কুরাইশরা দারুন নদওয়া বৈঠকে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করে। অবশেষে তিনি ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের জন্য মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.) এ হিজরতের সময়ে সঙ্গী ছিলেন।

দলগত কাজ:
শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে মহানবি (সা.)-এর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, আমানতদারিতা প্রভৃতি গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করবে।

মহানবি (সা.) এর মাক্কী জীবন থেকে আমাদের শিক্ষণীয়:

- সকলের মাঝে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া;
- আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা;

- বিপদে আপদে সর্বদা ধৈর্যধারণ করা;
- ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা;
- শত্রু হলেও তার আমানত রক্ষা করা;
- নামাজ আমাদের জন্য মহান আল্লাহর উপহার, তাই ওয়াক্তমতো নামাজ আদায় করা।

মাথা খাটিয়ে লেখো আরও কী শিক্ষণীয় আছে?

- ....
- ....
- ....
- ....

হযরত ইসমাইল (আ.)

হযরত ইসমাইল (আ.) ছিলেন আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পূর্বপুরুষ। তিনি পিতা ইবরাহিম (আ.) এর সাথে পবিত্র কাবাঘর নির্মাণ করেন। প্রিয় শিক্ষার্থী, আজ আমরা ইসমাইল (আ.)-এর জীবন ও চরিত্র-মাধুর্য সম্পর্কে জানব।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত ইসমাইল (আ.) ছিলেন ইবরাহিম (আ.)-এর জ্যেষ্ঠপুত্র এবং মা হাজেরার গর্ভজাত সন্তান। তাঁর জন্মের সময় পিতা ইবরাহিম (আ.)-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর। তিনি সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা বিবি হাজেরা মিসরের কিবতি রাজবংশীয় মহিলা ছিলেন। ইবরাহিম (আ.)-এর বৃদ্ধ বয়সে মহান আল্লাহর নিকট দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাঁকে উক্ত পুত্রসন্তান দান করেন। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন। অতএব আমি তাকে অতিসহনশীল এক পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিলাম।’ (সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১০০-১০১)

নির্বাসন ও জমজম কূপ সৃষ্টি

হযরত ইসমাইল (আ.)-এর জন্মের কিছুদিন পর ইবরাহিম (আ.) মহান আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে ও তাঁর মাকে মক্কার ফারান পর্বতের উপত্যকায় বিজনভূমিতে একটি বড় গাছের নিচে রেখে আসেন। বস্তুত এটি ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় পরীক্ষা। তিনি তাঁদের খাবারের জন্য এক থলে খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে আসেন এবং তাদের খাদ্য-পানীয় ও হেফাজতের জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন।

বিবি হাজেরা তাঁর সন্তানকে বুকের দুধ পান করিয়ে লালন-পালন করতে থাকেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের পানি ও খাবার ফুরিয়ে যায়। দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাইল পানির পিপাসায় ছটফট করতে থাকেন। তিনি শিশুর কান্না সহ্য করতে না পেরে পানি ও খাবারের সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন। এ

পাহাড়দ্বয়ে সাতবার ছোটাছুটির পরেও কোথাও পানি কিংবা খাবার পেলেন না। অবশেষে ইসমাইলের কাছে ফিরে এসে দেখতে পান যে, আল্লাহর অসীম কুদরতে শিশু ইসমাইলের পায়ের আঘাতে সে স্থানে পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এটাই হলো জমজম কূপের উৎস। হযরত হাজেরা (আ.) ঐ কূপ থেকে নিজে এবং তার শিশুপুত্র ইসমাইলকে পানি পান করান। তিনি মশক ভরে পানি রাখলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

কুরবানি

ইসমাইল (আ.) যখন ১৩ কিংবা ১৪ বছরের যুবক, তখন হযরত ইবরাহিম (আ.) স্বপ্নযোগে পুত্র ইসমাইল (আ.) কে কুরবানির জন্য আদিষ্ট হন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কঠিন পরীক্ষা। স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়ে ইবরাহিম (আ.) পুত্রকে বললেন, 'হে আমার সন্তান! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে কুরবানি করছি। এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী? তখন তিনি বললেন, হে আমার পিতা! আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন, তা-ই করুন। ইনশাআল্লাহ আমাকে আপনি ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন।' (সূরা আস সাফফাত, আয়াত: ১০২)

হযরত ইবরাহিম (আ.) মিনা প্রান্তরে প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি করতে শুরু করলেন। এমন সময় তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আওয়াজ শুনতে পেলেন, 'হে ইবরাহিম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।' (সূরা আস সাফফাত, আয়াত: ১০৫)। আল্লাহর ইচ্ছায় পুত্র ইসমাইল (আ.) এর স্থলে একটি সাদা দুম্বা কুরবানি হয়ে গেল আর ইসমাইল (আ.) দুম্বার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, 'আমি ইসমাইলকে এক মহান জবেহের বিনিময়ে মুক্ত করলাম এবং একে আমি পরবর্তী লোকদের মধ্যে স্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা করলাম।' (সূরা আস সাফফাত, আয়াত: ১০৭-১০৮) এ স্মৃতির সম্মানার্থে কুরবানি করা উম্মতে মুহাম্মাদির উপর ওয়াজিব।

কাবাগৃহ নির্মাণ

কাবাঘর সর্বপ্রথম ফেরেশতাগণ এবং পরে হযরত আদম (আ.) পুনর্নির্মাণ করেন। পরবর্তী সময়ে হযরত ইবরাহিম (আ.) আল্লাহর হুকুমে হযরত ইসমাইল (আ.) এর সহযোগিতায় কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। কাবাঘর নির্মাণের পর তাঁরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১২৭)।

ইসমাইল (আ.)-এর গুণাবলি ও মহত্ত্ব

কুরআন মাজিদে ইসমাইল (আ.)-এর সততা, ধৈর্য, সহনশীলতা, ওয়াদা পালন, সালাতের হেফাজতকারী, পরিবারকে সালাত আদায়ের নির্দেশদানকারী এবং আল্লাহর ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহ্বানকারী প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ৯টি সূরার ২৫টি আয়াতে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন যাবিহুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সমীপে স্বেচ্ছায় জীবন উৎসর্গকারী।

তিনি বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল আরবি ভাষাভাষী ছিলেন। নবি (সা.) বলেন, সর্বপ্রথম 'স্পষ্ট আরবি' ভাষা ব্যবহার করেন হযরত ইসমাইল (আ.) তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। (আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ) ইসমাইল (আ.)

ছিলেন কুরাইশি আরবি ভাষায় ওহিপ্রাপ্ত প্রথম নবি। এটি ইসমাইল (আ.) এর জন্য একটি অনন্য গৌরবের বিষয়। এ জন্য তাঁকে আবুল আরাব (أَبُوالعَرَب) বা আরবদের পিতা বলা হয়।

উপাধি

বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি জনৈক ব্যক্তির সাথে একটি নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষা করার অঙ্গীকার করেন। সে লোকটি কথা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে না আসলেও তিনি তার জন্য তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকেন। অতঃপর তৃতীয় দিন লোকটির সাথে তাঁর সেখানে দেখা হয়। (ইবনে কাসির) নিজের ওয়াদা রক্ষার জন্য তিন দিন পর্যন্ত কষ্ট করে অপেক্ষা করেছিলেন বলে তাঁকে আল্লাহ তা'আলা সাদেকুল ও 'আদ বা অঙ্গীকার পালনকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কুরআন মাজিদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'তিনি ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর রাসুল ও নবি।' (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৫৪)

মৃত্যু

হযরত ইসমাইল (আ.) ১৩৭ বছর বয়সে মক্কা নগরীতে ইন্তেকাল করেন (আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ)। প্রসিদ্ধ মত অনুসারে তাঁকে কাবার হাতিমে তাঁর মা হাজেরার কবরের পাশে দাফন করা হয়।

মহান আল্লাহর প্রতি ইসমাইল (আ.)-এর অগাধ বিশ্বাস ও আনুগত্য, ত্যাগ এবং পিতৃভক্তি, অঙ্গীকার পালন ইত্যাদি আমাদের জীবনের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

দলগত কাজ:

শিক্ষার্থীরা হযরত ইসমাইল (আ.) এর চরিত্রের উত্তম গুণাবলি সম্পর্কে পরস্পরে আলোচনা করবে এবং একটি পোস্টার তৈরি করবে।

হযরত ইসমাইল (আ:) এর জীবনী থেকে আমি যে সব গুণ চর্চা করবো।

- ....
- ....
- ....
- ....

হযরত উমর (রা.)

হযরত উমর (রা.) ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা নগরীর কুরাইশ বংশের বিখ্যাত আদি গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব। তিনি কুরাইশ বংশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। আর মাতার নাম খানতামা। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সেনাপতি হিশাম ইবন মুগিরার কন্যা। হযরত উমর (রা.) শিক্ষা-দীক্ষায় সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কবিতা লেখায় পারদর্শী ছিলেন। কুস্তিবিদ্যায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানে হযরত উমর (রা.)-এর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। সাহসী যোদ্ধা, কবি ও সুবক্তা হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল।

ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত উমর (রা.) ইসলাম ও মুসলমানদের ঘোরতর শত্রু ছিলেন। নবদীক্ষিত মুসলমানদের অমানুষিক নির্যাতন করতেন। তাঁর গৃহপরিচারিকা লুবানা ইসলাম কবুল করলে তিনি তাকেও নির্যাতন করেন। একদা তিনি তরবারি নিয়ে মহানবি (সা.) কে হত্যার জন্য ছুটলেন। পথিমধ্যে জানতে পারেন যে, তাঁর বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি গতি পরিবর্তন করে বোনের বাড়িতে যান এবং বোন ও ভগ্নিপতিকে প্রচণ্ড মারতে থাকেন। তখন তাঁরা কুরআন পাঠ করছিলেন। তাঁদের শরীর থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুতেই তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। ইসলামের প্রতি তাঁদের দৃঢ়তা দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী পড়ছিলে? উমরের বোন জবাব দিলেন, কুরআন পড়ছিলাম। হযরত উমর (রা.) বললেন, তা আমাকে দেখাও। বোন বললেন, তুমি অপবিত্র। অপবিত্র হাতে কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। বোনের এ কথা শুনে উমর (রা.) পবিত্র হয়ে এলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বাহার আয়াতগুলো পড়লেন। মহান আল্লাহর বাণী তাঁর মনের ভিতর তোলপাড় সৃষ্টি করে দিল। তিনি ইসলাম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। উমর (রা.) বললেন, নবিজি কোথায়? আমি তাঁর কাছে যাব, মুসলমান হব। এরপর তিনি প্রিয়নবির কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। মহানবি (সা.) দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আবু জাহাল অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব এ দুজনের একজনকে ইসলাম কবুল করার তাওফিক দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।' তাঁর ইসলাম গ্রহণ মূলত মহানবি (সা.)-এর উক্ত দোয়ারই ফল। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমর (রা.) কা'বার সামনে প্রকাশ্যে নামায আদায়ের ঘোষণা দিলেন। নবি (সা.) উমর (রা.)-এর উপর খুশি হয়ে তাঁকে 'ফারুক' বা সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী উপাধিতে ভূষিত করলেন।

ইসলামের সেবা

হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তিনি নিজের ধন-সম্পদের সর্বস্ব দিয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাবুক অভিযানে তিনি তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করা সম্ভব হয়। তিনি সকল যুদ্ধে মহানবি (সা.)-এর সাথি হয়ে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেন। খেলাফতের মহান দায়িত্ব পালনকালে তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের শাসন, বিচার ও অর্থব্যবস্থায় বহু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

চারিত্রিক গুণাবলি

হযরত উমর (রা.) ন্যায়বিচারক ছিলেন। তাঁর কাছে উঁচু-নিচু, ধনী-গরিব, আপন-পর কোনো ভেদাভেদ ছিল না। মদ্যপানের অপরাধে নিজ পুত্র আবু শাহমাকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন।

তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। অর্ধজাহানের খলিফা হয়েও তিনি অত্যন্ত দীনহীন ও সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। তিনি সাথে কোনো দেহরক্ষী রাখতেন না। বায়তুল মাল থেকে তাকে যে ভাতা দেওয়া হতো, তা-ও ছিল একেবারে নগণ্য। খাওয়া-দাওয়া করতেন একেবারে সামান্য। শুধু খেজুর ও রুটি দিয়ে আহার সম্পন্ন করতেন। খেজুর পাতার আসন ছিল তাঁর সিংহাসন।

তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল খুবই সাদাসিধে। তিনি তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করতেন। জেরুজালেমের খ্রিষ্টান শাসকের আহ্বানে তিনি একবার সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ও তাঁর ভৃত্য পালাবদল করে উটে আরোহণ করে জেরুজালেম পৌঁছান। উট যখন জেরুজালেম পৌঁছাল, তখন উটের পিঠে ছিল ভৃত্য আর খলিফা রশি ধরে হেঁটে আসছিলেন। তাঁর পরনে ছিল ধুলোমলিন ছিন্নবস্ত্র। খলিফার এই পোশাক ও অবস্থা দেখে খ্রিষ্টান শাসক ও অন্য সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

তাঁর চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি সত্য ও ন্যায়ের ব্যাপারে যেমন ইস্পাতসম কঠিন ছিলেন, তেমনি মানুষের অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টে ছিলেন মোমের মতো নরম। তিনি সাধারণ প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট জানার জন্য গভীর রাতে একাকী পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন। এরই ধারাবাহিকতায় একদিন গভীর রাতে এক গৃহে ক্ষুধার্ত শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। তখন তিনি বায়তুল মাল থেকে নিজ কাঁধে আটার বস্তা বহন করে সেই বাড়িতে গমন করেন। শিশুদের রুটি বানিয়ে খাওয়ানোর পর তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। তিনি বলতেন, 'যদি ফোরাত নদীর তীরে কোনো ছাগলের বাচ্চাও মারা যায়, এ বিষয়ে আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন।'

তিনি ছিলেন গণতন্ত্রমনা ও সুশাসক। রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ তিনি সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে সম্পাদন করতেন। প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করতেন।

তিনি ছিলেন সাম্য ও মানবতাবোধের মহান আদর্শ। তিনি শাসনব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) কে একজন সাধারণ লোকের কাছেও জবাবদিহি করতে হয়েছিল। তিনি একদা জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে অভিযোগ করলেন যে 'বায়তুল মাল থেকে প্রাপ্ত কাপড় দিয়ে কারও পুরো একটি জামা হয়নি, অথচ খলিফার গায়ে সে কাপড়ের পুরো একটি জামা দেখা যাচ্ছে। খলিফা অতিরিক্ত কাপড় কোথায় পেলেন?' তখন খলিফার পক্ষে তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ জবাব দিলেন 'আমি আমার প্রাপ্য অংশটকু আব্বাকে দিয়েছি। তাঁর ও আমার দুটুকরা মিলিয়ে তাঁর জামা তৈরি করা হয়েছে।' মানবতার ইতিহাসে একজন শাসকের এরূপ জবাবদিহির ঘটনা সত্যিই বিরল। আমাদের সমাজব্যবস্থায় শাসকদের জন্য এরূপ জবাবদিহির সুযোগ করা গেলে আশা করা যায় তারাও এ আদর্শে আদর্শবান হতে পারবেন।

হযরত উমর (রা.) একজন শিক্ষানুরাগীও ছিলেন। ইসলামের খেদমতে তিনি অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মক্কা, মদিনা, সিরিয়া, কুফা, বসরাসহ যেখানেই জয়লাভ করেছেন সেখানেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন।

হযরত উমর (রা.) সৃষ্টিকুলের ভাষাহীন পশু-পাখি ও প্রাণীদের প্রতি অত্যন্ত দরদি ছিলেন। পশু-পাখির প্রতি কেউ জুলম করে কি না, প্রাণিকুল অনাহারে থাকে কি না খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি বলতেন, 'এরাও মহান আল্লাহর সৃষ্টি। প্রতিটি প্রাণীর প্রতি দয়া প্রকাশ করা পুরস্কার পাওয়ার মতো কাজ।'

মোট কথা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। মানব চরিত্রের সকল ভালো গুণ ও মহান আদর্শের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর জীবনে। আমরা তাঁর জীবনাদর্শ ভালোভাবে জানব এবং সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়তে সচেষ্ট হবো।

দলগত কাজ:
শিক্ষার্থীরা হযরত উমর (রা.) এর চরিত্রের কঠোরতা ও কোমলতা সম্পর্কে আলোচনা করবে।
ইসলাম সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে– হযরত উমর (রা.) জীবনাদর্শ অবলম্বনে বিষয়টি আলোচনা করবে।

বাড়ির কাজ:
দায়িত্ববোধ সম্পর্কে পাঠবহির্ভূত হযরত উমর (রা.) এর জীবনের একটি ঘটনা লেখো এবং ঘটনার আলোকে পরিবার, সহপাঠী এবং সমাজের প্রতি তোমার কর্তব্য নির্ধারণ করো।

....

....

....

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ছিলেন আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর সর্বকনিষ্ঠ স্ত্রী। অনন্য চারিত্রিক মাধুর্য দ্বারা তিনি মুসলমানদের বিশেষ করে নারীসমাজের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন। এ ছাড়াও কুরআন, হাদিসে এবং ফিকহবিষয়ক জ্ঞানে তাঁর অবদান অপরিসীম।

জন্ম ও শৈশব

প্রসিদ্ধ মতে তিনি নবুয়াতের চতুর্থ বছরে মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত আবু বকর (রা.) এবং মাতা উম্মে রুম্মান। শৈশবকালেই তাঁর আচার-আচরণ, চাল-চলন ও কথাবার্তা সকলকে মুগ্ধ করেছিল।

মহানবি (সা.)-এর সাথে বিবাহ

নবুয়াতের দশম বছরে মহানবি (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী। স্ত্রী হিসেবে তাঁকে গ্রহণের মাঝে ইসলামের প্রভূত কল্যাণ ও হিকমত নিহিত ছিল।

শিক্ষা জীবন

পিতার কাছেই শিশু হযরত আয়েশা (রা.)-এর লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয়। তিনি পিতার নিকট থেকে কুষ্টিবিদ্যা ও কাব্যশাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনে সক্ষম হন। এ ছাড়া পিতার কাছে তিনি কাব্য, ইতিহাস, সাহিত্য ও প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন ছাড়াও তিনি গৃহস্থালি বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। তাঁর কৈশোর ও যৌবনের পুরোটা সময় কেটেছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মহানবি (সা.)-এর একান্ত সান্নিধ্যে। তাই মহানবির সাহচর্যে তিনি কুরআন, হাদিস ও ফিকহবিষয়ক জ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। নারীদের একান্ত বিষয়সমূহ তিনি মহানবি (সা.) এর কাছে জেনে অন্যদের শিক্ষা দিতেন।

ইফকের ঘটনা

ষষ্ঠ হিজরি সনে বনু মুস্তালিক যুদ্ধে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) রাসুল (সা.)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তাঁর গলার হার হারিয়ে যায়। হার খুঁজতে গিয়ে তিনি কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে যান। এতে তাঁর ফিরতে দেরি হয়। এ সুযোগে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, সাহাবি হাসসান বিন সাবিত, মিসতাহ ও হামনাহ (রা.) তাঁর বিরুদ্ধে গুজব ছড়াতে থাকে। পবিত্র কুরআনে এটি 'ইফকের ঘটনা' বলে পরিচিত। এতে তিনি চরম মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। তাঁর জীবন বিষণ্ন হয়ে ওঠে। এ ঘটনায় রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর পিতামাতা চরম উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যান। ফলে মহান আল্লাহ সূরা নূরের ১০টি আয়াত নাজিল করে আয়েশা (রা.)-এর নির্দোষিতা ও পবিত্রতা ঘোষণা করেন। এভাবে মুনাফিকদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো এবং তাঁর মর্যাদাও পবিত্র কুরআনে স্থান পেল।

ইসলামি জ্ঞান প্রসারে অবদান

ইসলামি শিক্ষা প্রচার ও সম্প্রসারণে আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি ছিলেন রাসুল (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতি, অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারিণী। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যক্তিগত জীবনসহ পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ইবাদাত, পরকাল, সর্বোপরি শরিয়তের সকল বিধি-বিধান সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করে মুসলিম উম্মাহকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

তিনি ছিলেন নারীদের মধ্যে সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি। অসংখ্য সাহাবি ও তাবেয়ী তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ২২১০টি।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ছিলেন একজন শিক্ষক। তিনি তাফসির, হাদিস, ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নারীদের বিভিন্ন বিষয়ের বিধান বর্ণনায়ও তিনি অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রে

একসাথে ২০০ এর অধিক শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করতেন। মুসতাদরাক আল-হাকেম গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, আয়েশা (রা.) থেকে শরিয়তের এক-চতুর্থাংশ বিধি-বিধান বর্ণিত আছে।

গুণাবলি

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ছিলেন অনুপম চরিত্র-মাধুর্যের অধিকারী। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাশক্তিসম্পন্ন, বিদুষী, রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক, তেজস্বিনী, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, গৃহকর্মে সুনিপুণা, শিক্ষয়িত্রী, সত্যের সাধিকা, অগ্নিবর্ষী বাগীশ, সচ্চরিত্রা, মধুর আলাপী, ধৈর্যশীল, আদর্শ স্ত্রী, জ্ঞানতাপস ও সদালাপী। এক কথায় মানবীয় চরিত্রের সকল গুণই তাঁর মধ্যে বিরাজমান ছিল। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল মুমিনা ছিলেন। তিনি সর্বদা মহান আল্লাহর উপর ভরসা রাখতেন। তাঁর সতীত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাঁর উসিলায় তায়াম্মুমের বিধান চালু করেন।

তিনি বছরের অধিকাংশ সময়ই রোযা রাখতেন এবং রাত্রিবেলায় আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগিতে নিজেকে মশগুল রাখতেন। দান-সাদাকা করতে তিনি পছন্দ করতেন। অসহায়, ফকির, মিসকিনকে কিছু দান করতে পারলে তিনি তৃপ্তি পেতেন। দানশীলতা, মিতব্যয়িতা, পরোপকারিতা, ধর্মপারায়ণতা, দয়াসহ সর্বপ্রকার গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন।

মর্যাদা

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) মহানবি (সা.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, 'নারী জাতির উপর আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-এর মর্যাদা তেমন, যেমন খাদ্যসামগ্রীর উপর সারিদের মর্যাদা।'(বুখারি ও ইবনে মাজাহ)। সারিদ হলো আরবের শ্রেষ্ঠ খাদ্য যা রুটি-গোশত ও ঝোলের সমন্বয়ে তৈরি হয়। রাসুল (সা.) আরও বলেন, 'আয়েশা (রা.) হলেন মহিলাদের সাহায্যকারিণী।' (কানজুল উম্মাল)

একবার আমর বিন আস (রা.) রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার কাছে প্রিয়তম ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বলেন, তাঁর বাবা।' (বুখারি) সুতরাং এ থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর সুউচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

ইন্তেকাল

উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ৫৮ হিজরির ১৭ রমযান ৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ জুলাই ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে সমাহিত করা হয়।

দলগত কাজ:
শিক্ষার্থীরা হযরত আয়েশা (রা.)- এর চরিত্রের উত্তম গুণাবলি ও মর্যাদা সম্পর্কে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

হযরত আয়েশা (রা.)- এর জীবনী আলোকে আমরা আচরণে যেসব পরিবর্তন আনব।

....

....

....

....

....

খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.)

হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.) ছিলেন আল্লাহর একজন ওলি ও ইসলামের একনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধক। তিনি ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, আফগানিস্তানসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বিশেষ অবদান রাখেন। আজ আমরা এ মহান সাধকের জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানব।

জন্ম ও পরিচয়

খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (রহ.) ৫৩০ হিজরি সনে পারস্যের ইস্পাহান নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাজা গিয়াস উদ্দীন হাসান এবং মাতা উম্মুল ওয়ারাহ। তাঁরা ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। এ জন্য তাঁর মা শৈশবে তাঁকে শুধু হাসান নামেই ডাকতেন। তাঁর পিতা ইসলামের একজন মহান সাধক ও সিস্তানের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ১৫ বছর বয়সে পিতৃ ও মাতৃহারা হন। তিনি গরিবে নেওয়াজ নামে অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

শিক্ষা জীবন

কুরআন মাজিদ শিক্ষার মাধ্যমেই খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.)-এর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। মাত্র ৯ বছর বয়সে তিনি কুরআন মাজিদ হেফজ করেন। এরপর তিনি খোরাসানের বিখ্যাত আলেমদের নিকট তাফসির, হাদিস, ফিকহ, ইলম ও মারিফাতের জ্ঞান লাভ করেন। এরপর তিনি বুখারা গমন করে কুরআন, হাদিস, শরিয়াত ও মারিফাতের জ্ঞানার্জন করেন। ২২ বছর বয়সে তিনি আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি তাঁর নিকট থেকে শরিয়াত, মারিফাত, তরিকত ও হাকিকতের বাতিনী ফায়িজ লাভ করেন। ৩২ বছর বয়সে তিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ উসমান হারুনীর (রহ.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। এখানে তিনি চিশতীয়া তরিকায় দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ভারতবর্ষে আগমন ও ইসলাম প্রচার

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.) স্বপ্নযোগে মহানবি (সা.)-এর নির্দেশ পেয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ৯০ লাখ লোক ইসলাম গ্রহণ করে বলে জানা যায়। তিনি ভারতের আজমিরে এসে ইসলামের আলো ছড়ানোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মারিফাত চর্চার নামে সমাজ-সংসার ত্যাগ করেননি। তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য আজমির, বাদায়ুন, বেনারস, কনৌজ ও বিহার প্রভৃতি স্থানে খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ভারতের বর্ণ প্রথার অমানবিকতা থেকে নিম্ন বর্ণের মানুষদের রক্ষার চেষ্টা করেন।

ইন্তেকাল

ইসলামের এ মহান সাধক ৬৩২ হিজরির ৬ রজব ইন্তেকাল করেন। ভারতের আজমিরে তাঁর মাজার রয়েছে।

আমাদের জন্য শিক্ষণীয়

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.) অত্যন্ত সরল জীবনযাপন করতেন। তিনি ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও সমাজকে কখনও আলাদাভাবে চিন্তা করতেন না। এ জন্য তিনি সমাজ-সংসার ও রাজনীতির সাথেও যুক্ত থেকে মানব কল্যাণে কাজ করে গেছেন। তিনি একাধারে একজন সাধক, শাসক ও যোদ্ধা ছিলেন। আমরা তাঁর জীবনচরিত থেকে শরিয়াতের চর্চার মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা চর্চার শিক্ষা পাই।

দলগত কাজ:
শিক্ষার্থীরা খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (রহ.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবে এবং নিজেদের জীবনে অনুশীলন করবে।

এই অধ্যায়ে আমরা যেসকল ব্যক্তি সম্পর্কে জানলাম তাঁরা প্রত্যেকেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের জীবন থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় অনেক কিছু রয়েছে। এখন তোমার কাজ হল সপ্তম শ্রেণিতে যে জীবনাদর্শগুলো তুমি পাঠ করলে সেগুলো থেকে কোন কোন নৈতিক এবং মানবিক গুণাবলি তুমি খুঁজে পেয়েছ তা নির্ণয় করা এবং সেগুলো নিজের জীবনে চর্চা করার পাশাপাশি অন্যকে চর্চা করতে অনুপ্রাণিত করা। এই কাজটি কিভাবে করবে তা শিক্ষক তোমাদের বুঝিয়ে দিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সম্প্রীতি

প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা বছরের একেবারে শেষাংশে চলে এসেছি। এবারে আমরা একটি নতুন বিষয় শিখব। বিষয়টি ইসলাম শিক্ষার পাঠ্য হিসেবে নতুন হলেও তোমরা কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণি এবং সপ্তম শ্রেণির এখন পর্যন্ত পাঠ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে জেনে এসেছ। এবারে আমরা জানব ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কে।

সম্প্রীতি শব্দটির অর্থ হলো সদ্ভাব, সৌহার্দ্য, সন্তোষজনক আচরণ, সুভাব। সমাজের মানুষ যখন একে অপরের সাথে সব রকমের ঝগড়া-বিবাদ ও সংঘাত পরিত্যাগ করে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, হৃদ্যতা, সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব বজায় রেখে মিলেমিশে জীবনযাপন করে এমন সম্পর্ককেই সম্প্রীতি বলা হয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বলতে একই সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে বুঝায়। যেখানে সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কোনো আমিত্ব ও জাত্যভিমান থাকে না। কেউ কাউকে ছোট ভাবে না, আবার কেউ নিজেকে বড়ও ভাবে না। কেউ কাউকে অসম্মান করে না, আবার নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবিও করে না। ধর্মের নামে কোনো ধরনের সহিংসতা ছড়ায় না। সবাই পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে মিলেমিশে বসবাস করে।

ইসলামে সম্প্রীতির শিক্ষা

ইসলাম পরমতসহিষ্ণুতার ধর্ম, সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলামে সকল ধর্ম ও ধর্মীয় মতামতকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। কোনো ধর্ম বা ধর্মাবলম্বীকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয় না। ইসলামে সকল মানুষে মিলে-মিশে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। ইসলামের সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ (সা.) কে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর প্রেরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ○

অর্থ: 'আমি আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

তাই তিনি সমগ্র মানব জাতির নবি। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন, ‘বলুন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসুল।’ (সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৫৮)

আর রাসুলুল্লাহ (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমার আগে প্রত্যেক নবিকে পাঠানো হয়েছে বিশেষ করে প্রত্যেকের স্ব-স্ব জাতির জন্য। কিন্তু আমাকে পাঠানো হয়েছে মানবকুলের জন্য।’ (বুখারি) তাই মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে মানব জাতির মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই।

ইসলামের শিক্ষা হলো মানব সম্প্রদায় একটি অভিন্ন জাতি। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত মানুষ এসেছে, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে আসবে তারা সবাই আদম সন্তান এবং মহান আল্লাহর সৃষ্টি। একটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বসবাস করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্ম ও বর্ণ আলাদা আলাদা হলেও তাদের মূল জাতিসত্তা এক, তারা মানব জাতি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ قف

অর্থ: ‘সকল মানুষ একই জাতিভুক্ত।’ (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১৩)

এছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতে সৃষ্টিজগৎ মহান আল্লাহর একটি পরিবার। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘সমস্ত সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর পরিবারস্বরূপ। সুতরাং সৃষ্টিজগতের মধ্যে সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় যে আল্লাহর পরিবারের সাথে সদ্ব্যবহার করে।’ (বায়হাকি)

তাই আমরা পরিবারের সদস্যদের সাথে যেমন সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখি তেমনি সমাজের অন্যসকল মানুষের সাথেও সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রাখব।

ইসলাম সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতার দিয়েছে। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিক স্বাধীনভাবে নিজনিজ ধর্ম পালন করতে পারবে। এতে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

অর্থ: ‘তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আমার জন্য আমার দ্বীন।’ (সূরা আল-কাফিরুন, আয়াত: ৬)

তাছাড়া ইসলামে ধর্ম গ্রহণে জন্য জোর-জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ আল্লাহ বলেছেন-

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۖ قف

অর্থ: 'দ্বীন সম্পর্কে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই।' (সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৬)
রাসুলুল্লাহ (সা.) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা কখনই ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, কারণ অতীতে বহু জাতি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।'

তিনি মদিনার মুসলিম, ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিকসহ সকল ধর্মের মানুষের সহাবস্থান, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, ধর্মচর্চার সমান সুযোগ-সুবিধা এবং নিজস্ব কৃষ্টি-কালচারের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি নারী ও শিশু এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছেন। ইসলাম সহমর্মিতা ও সহানুভূতির ধর্ম। পরস্পরের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসা, একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এর মাধ্যমে সবার মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর হয়। এছাড়া সর্বদা প্রতিবেশীর বিপদে-আপদে সহযোগিতা প্রদান করা ও তার প্রতি সহমর্মিতা জানানো ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। মহান আল্লাহ বলেন, 'ভালো কাজ করা ও তাকওয়া অবলম্বনে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। পাপ ও সীমালংঘনের কাজে কেউ কাউকে সহযোগিতা করবে না।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ২)

ইসলাম সর্বজনীন মানবীয় ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী। ইসলাম চায় বহু জাত, গোত্র এবং ধর্মের সমাজে সকলেই মিলেমিশে একজাতি হিসেবে বসবাস করবে। কেউ কারো অধিকার বিনষ্ট করবে না, কাউকে কষ্ট দেবে না, অন্য ধর্ম ও ধর্মের অনুসারীর উপর আঘাত করবে না। এমন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যই রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনা সনদে সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র মিলে একটি জাতি গঠন করেন।

ইসলাম মানুষকে নিছক মানুষ হিসেবে সম্মান দিতে শেখায়। মানুষের মানবিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ধর্মের বিবেচনা ইসলামের কাছে গৌণ। মানুষের মানবিক মর্যাদা সবকিছুর উর্ধ্বে আখ্যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ

অর্থ: 'নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দিয়েছি।' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত: ৭০)

ইসলাম অন্য কোনো ধর্মের উপাস্য বা দেবদেবীকে উপহাস, ভর্ৎসনা, গালাগাল এবং নিন্দা করতে নিষেধ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থ: '(হে মুমিনগণ!) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের উপাসনা করে তোমরা তাদের গালি দিও না।' (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১০৮)

কুরআন মাজিদের উল্লিখিত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা করে সকল ধর্মের অনুসারীদের মাঝে সুসম্পর্ক রক্ষা করা এবং অন্য ধর্মাবলম্বী এবং তাদের উপাস্যকে কোনো রকমের ভর্ৎসনা বা উপহাস বা নিন্দা করা ইসলামে একেবারেই নিষিদ্ধ। অথচ বর্তমান বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, নবি, কিংবা ধর্মপ্রচারকের নামে কুৎসা রটনা করা হচ্ছে, ধর্মের নামে গুজব ছড়িয়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে। যা কোনো ধর্মেরই শিক্ষা নয়। ইসলামে ধর্মের নামে গুজব ছড়িয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, রক্তপাত ও মানব হত্যা করা নিষিদ্ধ এবং জঘন্য অপরাধ। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে রক্তপাতকারীর জন্য কঠোর শাস্তির ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩২)

সকল ধর্মের অনুসারীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামের শিক্ষা। মহানবি (সা.) মদিনার ইয়াহুদি, খ্রীষ্টানসহ সকল ধর্মাবলম্বীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। তাই আমরাও সকল ধর্মের অনুসারীদের সাথে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় রাখব, সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুশরিকদের মধ্যে কেউ যদি আপনার নিকট আশ্রয় চায় তাহলে আপনি তাকে আশ্রয় দেবেন, এরপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবেন।' (সূরা তাওবা, আয়াত: ৬)

এছাড়া মহান আল্লাহ ইসলাম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের প্রতি দয়ালু ও শ্রদ্ধাশীল হতে নির্দেশ করেছেন। তাদের প্রতি কোনো ধরনের আক্রমণাত্মক পন্থা বা আপত্তিকর ভাষা ব্যবহারেও নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন: '(হে রাসুল সা.!) আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে যুক্তিতর্ক করুন সর্বোত্তম উপায়ে।' (সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫)

বাংলাদেশে ইসলাম এসেছে আউলিয়া ও উদার ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে। তারা এই জনপদে এসে সকলের সাথে সম্প্রীতি ও ভালো বাসার সম্পর্ক রেখে এখানে ইসলামের মহান শিক্ষা প্রচার করেছেন। আমাদের দেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই আমরা এদেশের নাগরিক। কেউ কারো শত্রু নয়। আমরা হাজার বছর ধরে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে আসছি। আমাদের এই ধর্মীয় সম্প্রীতি ও নাগরিক সৌহার্দ্য নষ্ট হতে পারে এমন কোনো কাজ করব না। এটাই আমাদের ইসলামের মহান শিক্ষা। মহানবি (সা.) ও সাহাবিদের জীবনী পড়লে আমরা এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বহু নজির দেখতে পাই।

এবার শিক্ষক তোমাদেরকে দু'জন ব্যক্তি সম্পর্কে বলবেন যাঁরা সর্বদা সম্প্রীতি বজায় রেখে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। কয়েকটি আকর্ষণীয় এবং আনন্দময় কাজ করার মাধ্যমে তোমরা এখন তাদের সম্প্রীতিমূলক কাজ সম্পর্কে আরও জানতে পারবে। তাদের কার কোনো কাজটি তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে তা বন্ধুদের জানাবে এবং উপস্থাপন করবে। এর মাধ্যমেই সপ্তম শ্রেণির ইসলাম শিক্ষার পাঠের সমাপ্তি হবে।

ফ্লাইওভার :
উন্নয়নের পথে,
পথ চলি একসাথে

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এসেছে বিপুল পরিবর্তন। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে শেখ হাসিনা সরকার সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নে যুগান্তকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ/উদ্যোগ নিয়েছে, যার সুফল আমরা ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা), মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার, মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোডে মো. জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, কুড়িল ফ্লাইওভার, বনানী ফ্লাইওভার, মগবাজার- মৌচাক ফ্লাইওভার, চট্টগ্রামের আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভার, কালশি ফ্লাইওভার, হাতির ঝিল প্রকল্প, চার লেনবিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, বিআরটি প্রকল্প, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রকল্পসহ দেশব্যাপী অসংখ্য ফ্লাইওভার ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সড়ক, মহাসড়ক ও নগরীকে যানজটমুক্ত করার পাশাপাশি সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ
৭ম শ্রেণি
ইসলাম শিক্ষা

তোমরা মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো

–আল কুরআন

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **'৩৩৩'** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য